// বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৮ বর্ষ। ৪৩২ সংখ্যা। পৌষ, ১৩০৭; জানুয়ারী, ১৯০১। ৭ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জাতীয় মহামেলা—বড়দিনের অবকাশে ভারতসন্তানগণ লাহোরে সম্মিলিত হইয়া মাতৃপূজা করিবেন। লাহোরবাসীদিগের সুবুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা ক্ষণস্থায়ী পাণ্ডাল নির্ম্মাণে অর্থ নষ্ট না করিয়া (ষোড়শ) কন্‌গ্রেসের জন্য একটী স্থায়ী "হল" নির্ম্মাণ করিতেছেন। ভারত-হিতৈষী "ব্রাডলর" নামে ইহার নাম "ব্রাডল হল" হইবে।

নূতন সেতু—ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদীর উপর কাউনিয়ার নিকট এক সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। জলপাইগুড়ির নিকট হইতে আর এক সেতু নির্ম্মাণার্থে গবর্ণমেণ্ট ১৯ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

রেল বিস্তার—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে হাবড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখন কলিকাতা হইতে পুরী পর্য্যন্ত যাইবার বড়ই সুবিধা হইল।

যুদ্ধ—(১) ঈশ্বরেচ্ছায় চিনের যুদ্ধস্রোত প্রবাহিত হইতে না হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছে। এখন নির্ব্বিঘ্নে সন্ধি স্থাপিত হইলে হয়। (২) বুর যুদ্ধের এখনও অবসান হয় নাই। স্বদেশ-প্রেমিকেরা যথার্থই প্রাণপণে যুঝিতেছে। প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টস ইংলণ্ডের প্রধান সেনানায়ক হইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সেনাপতি কিচনার তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

বিদুষী মাতা—মেফকিঙ-রক্ষক সুবিখ্যাত সেনাপতি বেডেন পাওয়েলের গর্ভধারিণী জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিনী। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার অনেক পুস্তক বিদেশী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন।

ক্রুগারের অভ্যর্থনা—ট্রান্সভাল সাধারণতন্ত্রের বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট ক্রুগারকে

ফরাসীরা মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করিয়াছে।

হস্তি-বধ—হস্তিদন্তের জন্য আফ্রিকায় প্রতিবর্ষে ৬০ হাজার হস্তী হত হয়। অন্যান্য দেশে আরও আছে।

মৃত্যু—"অন্তঃপুর" পত্রের ও "সুমতি-সমিতির" সদ্গুণবতী সম্পাদিকা বনলতা দেবীর অকাল মৃত্যুতে আমরা বিশেষ ব্যথিত ও শোকার্ত্ত হইয়াছি। অল্পবয়সে বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, সুশীলতা, ঈশ্বরভক্তি, স্বদেশপ্রেম—বিশেষতঃ নারীজাতির সেবা-নুরাগ—এই সকল গুণে ইনি এরূপ ভূষিতা হইয়াছিলেন যে, ইঁহাদ্বারা নারীজাতির ও দেশের মুখ যে সমুজ্জল হইবে, তাহার সম্পূর্ণ আশা হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় কলিকা সৌরভ দান করিয়াই বিশীর্ণ হইল, প্রস্ফুটিত হইতে পারিল না। এ পুষ্প সৌন্দর্য্য ও সৌরভে অমর লোককে চির আনন্দিত করুক।

(২) লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল যশীরামের মৃত্যুতে পঞ্জাব প্রদেশবাসী সকলেই শোক করিতেছেন। ইনি একজন প্রতিভাশালী, সাধুচরিত্র ও স্বদেশানুরাগী কৃতবিদ্য লোক ছিলেন।

(৩) পাটনা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস সাহিত্যাচার্য্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ ও সুবক্তা ছিলেন। "বিহার সংস্কৃত সঞ্জীবন সমাজ" নামক পরীক্ষা সমাজ স্থাপন করিয়া সংস্কৃত চর্চ্চার সহায়তা করিয়াছেন।

সদাশয় ইংরাজ—রেবিনিউ বোর্ডের সিনিয়ার মেম্বার ওলডহাম সাহেব কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিতে-ছেন। সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং কে, জি গুপ্ত-প্রমুখ ধনাঢ্য কৃতবিদ্য ও উচ্চ পদস্থ বাঙ্গালীগণ তাঁহার সম্মাননা করিয়া কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। ওলডহাম যেমন এ দেশের হিতৈষী ছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার পদে সেই-রূপ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী বোল্টন সাহেব। কালা বোবা স্কুল কমিটীর সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি ইতিমধ্যে ভারত-হিতৈষিতার অনেক পরিচয় দিয়াছেন।

"নারীণাং ভূষণং পতিঃ"—কেবল হিন্দু নারীরা পতিহীনা হইয়া দুর্ভগা হন না—ইউরোপেও আজি কালি ইহার দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আমাদের ভারতেশ্বরী এ বিষয়ে অগ্রণী। সম্প্রতি ইটালীর রাজা হম্বার্ট হত হওয়া অবধি তাঁহার পত্নী মারগারেটা দুঃখিনীর বেশ ধারণ করিয়া-ছেন। তাঁহার মণিমুক্তা হীরক স্বর্ণ-খচিত বস্ত্রালঙ্কার আত্মীয়দিগকে ও তত্রত্য যাদুঘরে দান করিয়াছেন। তিনি বিলা-সিনীর অগ্রগণ্যা ছিলেন, শত শত নূতন ফ্যাসনের পরিচ্ছদে গৃহ সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন।

বাঙ্গালীর বড় পদ—(১) বাবু সুরেন্দ্র নাথ দত্ত পারস্য উপসাগরে ফরাসী দূত নিযুক্ত হইয়াছেন, ফরাসীদের স্থানীয় বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করিবেন।

(২) এ দেশে ৩০০০ টাকা বেতনের জন্য ৩ জন আছেন, তন্মধ্যে মেঃ বি এল গুপ্ত প্রথমস্থানীয়।

কুমারী কলেটের স্মৃতি—এই মহাপ্রাণা ইংরাজরমণী অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে রাজা রামমোহন রায়ের যে জীবন-চরিত অর্দ্ধাবয়বে রাখিয়া যান, তাহা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। H. Collet, Bucklesbury, London, এই ঠিকানায় দুই শিলিঙ মূল্যে পুস্তক পাওয়া যায়।

ধর্ম্মোপদেশ।

(খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তক হইতে সংগৃহীত)।

১। ঈশ্বর জ্যোতিঃস্বরূপ, তাঁহাতে কিছুমাত্র অন্ধকার নাই। আমরা যদি অন্ধকারে ভ্রমণ করি এবং মুখে বলি আমরা তাঁহার সঙ্গে আছি, তাহাহইলে আমরা মিথ্যা কথা বলি এবং সত্যের অনুসরণ করি না। তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন, আমরাও জ্যোতিতে থাকিলে পরস্পরে পরস্পরের সহায় হই।

২। কেহ দুই প্রভুর সেবা করিতে পারে না, কারণ সে হয় একজনকে ঘৃণা করিবে ও অন্যকে ভাল বাসিবে, নতুবা একজনের অনুগত হইয়া অন্যকে তুচ্ছ করিবে। তোমরা ঈশ্বর ও সংসারের যুগপৎ সেবা করিতে পার না। ম্যাথিউ ৬অ ২৪।

৩। ঈশা বলিলেন, ও ইস্রায়েল!* শ্রবণ কর "আমাদের প্রভু পরমেশ্বর একই প্রভু এবং তুমি প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমুদায় হৃদয়, সমুদায় আত্মা, সমুদায় মন এবং সমুদায় শক্তির সহিত ভালবাস। এই প্রথম আদেশ। দ্বিতীয় আদেশ ইহার সমতুল্য—তোমার প্রতিবাসীকে আত্মবৎ প্রীতি কর। এ দুটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আদেশ আর নাই।

৪। সময় আসিতেছে—এমন কি এখনি আসিয়াছে—সত্য ঈশ্বরোপাসকেরা সেই পিতাকে প্রাণরূপে এবং সত্যরূপে পূজা করিবেক; কারণ সেই পিতা চান যে এরূপ ব্যক্তিরাই তাঁহার পূজা করে।

৫। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ (spirit); যাহারা তাঁহার পূজা করে, প্রাণরূপে ও সত্যরূপে পূজা করিবেক।—জন ৪ অ, ২৩,২৪।

৬। তোমরা আহার কর, কি পান কর, কি যে কোন কর্ম্ম কর, তাহা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য কর। ১ করিন্থীয় ১০ অ, ৩১।

৭। তোমরা পিতৃভক্ত সন্তানদিগের ন্যায় ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী হও; সকল ভোগ্য বস্তুর জন্য পিতা পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ

* এখানে ইহুদীজাতি।

দেও। ঈশ্বরের শাসনাধীনে পরস্পরে পরস্পরের অধীন হও।—ইফিসীয় ২০, ২১।

৮। ভ্রাতৃগণ। সাবধান, তোমাদের মধ্যে কাহাকেও অবিশ্বাসের কুমন্ত্রণা যেন জীবন্ত পরমেশ্বর হইতে ভ্রষ্ট না করে।—হিব্রু ৩ ম, ১২।

৯। আমরা যখন অমোঘ নিত্যরাজ্য পাইয়াছি, ঈশ্বর কৃপা করুন্ আমরা যেন ভক্তি ও পবিত্র ভাবের সহিত তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে পারি। কারণ আমাদের ঈশ্বর (দগ্ধেন্ধনমিবানলং) দগ্ধকারী অগ্নি।—হিব্রু ১২ অ, ২৫-২৯।

অতএব তোমরা ঈশ্বরের অধীন হও।—জেম্‌স ৪ অ, ৭।

১০। ঈশ্বরকে ভয় কর—পিটার ২,১৭।

১১। ঈশ্বর-প্রেমের পরিচয় এই যে আমরা তাঁহার আদেশ পালন করি; তাঁহার আদেশ সকল ক্লেশকর নয়।—১ জন ৫ অ, ৩।

১২। হে প্রিয়বন্ধুগণ, তোমাদের অতি পবিত্র বিশ্বাসের উপর জীবন গঠন কর এবং পবিত্রাত্মার নিকট প্রার্থনা কর।—জুডা ২০,২১।

১৩। তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরা সেইরূপ পূর্ণ হও। ম্যাথিউ।

১৪। আমি অনুরোধ করি পরমাত্মার (sprirt) মধ্যে বিচরণ কর, তাহাহইলে ইন্দ্রিয়-লালসা তৃপ্ত করিতে হইবে না। কারণ ইন্দ্রিয় আত্মার বিরুদ্ধে কামনা করে এবং আত্মা ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধে কামনা করে, ইহারা পরস্পরে পরস্পরের বিরোধী। অতএব তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহাই করিতে পার না।

১৫। তোমরা যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও, তোমরা নিয়ম শৃঙ্খলের অধীন নও।

১৬। যদি আত্মাতে আমরা বাস করি, তবে এস আত্মাতে বিচরণ করি।

আমরা যেন পরস্পরকে উত্ত্যক্ত ও নষ্ট করিয়া বৃথা আত্ম-গৌরবের অভিলাষী না হই। গালিসীয় ৫ অ, ১৬, ১৭, ১৮, ২৫, ২৬

১৭। সুরাপানে মত্ত হইও না, তাহাতে অমিতাচারী হইতে হয়। ঈশ্বরের (spirit) তেজেতে পূর্ণ হও। ইফিসীয় ৫ অ, ১৮।

নারীসুহৃদ।

রাজা রাধাকান্ত দেবের "স্ত্রী শিক্ষা-বিধায়ক" পুস্তক যে সময়ে মুদ্রিত হয়, সে সময় মুদ্রাযন্ত্রের সম্যক্ উন্নতি হয় নাই। এক্ষণে মুদ্রাযন্ত্র ও বাঙ্গালা ভাষা যে উন্নতি লাভ করিয়াছে, তৎকালে তাহার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। এই সকল কারণে পুস্তক-খানির ভাষা মুদ্রাঙ্কন ইত্যাদি সবই বিচিত্র!

১৮২২ খ্রীঃ অব্দে এই পুস্তক প্রচারিত

হয়। এই পুস্তক প্রণয়নের নিমিত্ত রাজা রাধাকান্ত দেবকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কারণ তৎকালে মনোভাব লিপিবদ্ধ করিতে হইলে পারসী বা সংস্কৃতই প্রধান সহায় ছিল। ইহা হইতে অতি সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে এই অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে কিরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি যে সকল শাস্ত্র-সম্মত যুক্তি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও হৃদয়ের উদারতা এই উভয় গুণেরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

তিনি অতি প্রাচীন কালের উদাহরণাদি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তিনি লিখিয়াছেন চিত্রলেখা, লীলাবতী, খনা প্রভৃতি প্রাচীন রমণীগণ নানা শাস্ত্রে পারদর্শিনী ছিলেন। আধুনিক কালের প্রারম্ভে যে সকল সুশিক্ষিতা মহিলার অভ্যুদয় হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে রাণী ভবানী ও হটু বিদ্যালঙ্কারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল রমণী বিদ্যালাভ ও বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা যশস্বিনী হইয়াছেন ও অতি সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলেই এতদ্দেশীয় রমণীগণ সচরাচর গৃহকর্ম্মাবকাশে অলস ও হীন ভাবে সময়াতিপাত করেন। সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে চিত্তের সদ্বৃত্তি সকলকে সুপ্রস্ফুটিত করিতে হয়, সেরূপ কার্য্যে বিদ্যাচর্চ্চা একান্ত আবশ্যক। ইহাতে মনে কর্ত্তব্যজ্ঞান বিচারশক্তি সত্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল পরিবর্দ্ধিত হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে কথিত আছে যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে শাস্ত্রশিক্ষা যদি বিন্দু মাত্র দোষাবহ হইত, তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য কখনই এ পাপ করিতেন না। অহল্যা বাইয়ের কথা অনেকেই জানেন, তিনি স্বয়ং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। স্ত্রীশিক্ষায় যে নারীজাতির মানসিক সম্যক্ উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে, রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন।

ঈশ্বর কেবল গৃহকর্ম্মাদি সাধনের জন্যই নারীজাতির সৃষ্টি করেন নাই। পুরুষজাতি যেমন বিদ্যা-চর্চ্চা করেন ও নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করেন, স্ত্রীজাতিরও তদনুরূপ করিতে পারা উচিত। কোনও রূপে সংসারে জীবনধারণ করাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নহে। মানব জীবনের অন্তরালে অতি মহৎ উদ্দেশ্য সকল লুক্কায়িত আছে। জীবনে সৎপথ অবলম্বন করিয়া চলা, ন্যায় ও কর্ত্তব্যের প্রতি অনুরাগ—এ সকল ইচ্ছা করিলেই চরিত্রে প্রতিফলিত করা যাইতে পারে; কিন্তু প্রাণে সেই ইচ্ছা জাগাইয়া দিবার পক্ষে বিদ্যা-শিক্ষা প্রধান উপায়। অন্তঃপুরচারিণী নারীজাতির জীবন গঠিত

করিবার এই যে প্রধান সহায়, ইহা হইতেই বঙ্গরমণী বঞ্চিতা ছিলেন। মহানুভব রাজা রাধাকান্ত দেবের যত্ন ও চেষ্টায় সে অভাব দূর হইবার সূত্রপাত হয়।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় তাঁহার প্রাচীন ধর্ম্মসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সতীদাহের সপক্ষে ও বিধবাবিবাহের বিপক্ষে অনেক আন্দোলন করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি তিনি স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত যাহা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য শিক্ষিতা বঙ্গরমণী মাত্রেই তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ।

তৎকালে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে সকল অসার যুক্তি প্রচলিত ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান যুক্তি এই যে স্ত্রীলোকের পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা অতীব দুরূহ কর্ম্ম। অনেকে বলিতেন যে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের এমন বুদ্ধি নাই, যাহাতে তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। রাজা রাধাকান্ত দেব এই যুক্তির বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"যদি বল স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অল্প এ কারণ তাহাদের বিদ্যা হয় না, অতএব পিতা মাতাও তদ্বিদ্যাবিষয়ে উদ্যুক্ত হয়েন না। এ কথা অতি অনুপযুক্ত। কারণ এ দেশীয় স্ত্রীলোকদের পাঠাদি বিষয়ে বুদ্ধি পরীক্ষা সংপ্রতিক কেহই করেন নাই। এবং শাস্ত্রবিদ্যা, ও জ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করাইলে যদি তাহারা অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তবে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহা উচিত হয়। এদেশীয় লোকেরা বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন না, বরং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ বিদ্যাভ্যাসে উদ্যুক্ত হয়, তবে তাহাকে কিম্বদন্তীমাত্র-সিদ্ধ নানা অশাস্ত্রীয় প্রতিবন্ধক দর্শাইয়া এবং ব্যবহার-বিরুদ্ধ কহিয়া নিবৃত্ত করান। দেখ তাহারা গৃহকর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইয়া গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত কেবল স্ববুদ্ধিতে স্বস্তিক ও চুবড়ী, আলপানা ও খদিরাদি-নির্ম্মিত নানা প্রকার হস্তী রথ ঘোটক মনুষ্য ইত্যাদি প্রতিমূর্ত্তি করে, যাহা পুরুষে গুরূপদেশ ব্যতিরিক্ত কদাচ করিতে পারে না, এই সকল অনায়াসে করে, তবে কি তাহারা বাল্যকালাবধি বিদ্যাশিক্ষা করিতে অশক্ত হয়? এমত নহে।"

হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজা রাধাকান্ত দেব পূর্ব্বোল্লিখিত সামাজিকগণের অসার যুক্তি যেরূপ সুন্দরভাবে খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সহৃদয়তা ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ইহাও প্রকাশ্য ভাবে উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে তাঁহাদের পরিবারের প্রায় সকল মহিলাই শিক্ষিতা।

অনেকে বলেন স্ত্রীশিক্ষার ফল ভাল হয় না, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে স্ত্রীশিক্ষার ফল অতি মঙ্গলজনক। তাহা না হইলে মাননীয় স্বর্ণকুমারী দেবী, চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ও কামিনী

সেন প্রভৃতি সুশিক্ষিতা মহিলার এত সম্মান ও আদর হইত না।

"স্ত্রীশিক্ষাবিধায়কে" এক স্থলে লিখিত হইয়াছে যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকে স্বতঃই বিনীতা, লজ্জাশীলা, পতি-পুত্রা-নুরাগিণী ও আত্মীয় স্বজনের আনন্দ-দায়িনী হয়েন। অনেকের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহাদের বিশ্বাস যে বিদ্যাশিক্ষা করিলে স্ত্রীলোকে নির্লজ্জ হয়—তাহাদের গুরুজনে ভক্তি—ভাই বোনে প্রীতি থাকে না—কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। কারণ বিদ্যাশিক্ষা বা শাস্ত্রালোচনায় এমন কোন বিষয়ই নাই যাহাতে স্ত্রীচরিত্র বিকৃত হইতে পারে। তবে মন্দ হওয়া যাহার নিয়তি, বিদ্যাশিক্ষা করিলেও তাহার চরিত্র মন্দ হইবে, না করিলেও হইবে। পুরুষদিগের মধ্যেও অনেক শিক্ষিত দুশ্চরিত্র লোক দেখা যায়। বরং দুশ্চরিত্র পুরুষ বা স্ত্রীলোককে সৎপথে আনিবার পক্ষে বিদ্যা-শিক্ষা প্রধান সহায়।

স্ত্রী-শিক্ষাবিধায়কের অপর একস্থলে স্ত্রী-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিলে কেবল যে তাহাদের নিজেদের মঙ্গল হয় তাহা নয়—যে পরিবারের গৃহিণী শিক্ষিতা হয়েন, সেই পরিবারে সংসারিক কার্য্যের সুশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। আমরা প্রতিপদে এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাইয়া থাকি। আয় ব্যয়ের হিসাব স্ত্রীলোকেরা করিতে পারিলে গৃহের পুরুষগণ সে সময়ে অন্য আবশ্যক কর্ম্ম করিতে পারেন। পরি-বারস্থ অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের শিক্ষা দিবার পক্ষে স্ত্রী-শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। কারণ বাড়ীর গৃহিণী শিক্ষিতা হইলে সে পরিবারের অল্পবয়স্ক বালকবালিকারা তাঁহার নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিতে পারে। অল্পবয়স্ক বালককে যে সে পাঠশালায় পাঠাইলে যে কি বিষম কুফল উৎপন্ন হয়, তাহা বর্ণনাতীত। বাল্যকালে শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত বলবতী হয়। এই অবস্থায় যদি বালক কুসঙ্গে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার উন্নতির আশা সেই খানেই নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু যদি বাড়ীর গৃহিণী শিক্ষিতা হয়েন, তাহা হইলে বালকবালিকাদিগকে এই ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। অধিক কি স্ত্রী-শিক্ষার উপর প্রত্যেক পরিবারের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে।

(ক্রমশঃ)

জাপান-সাম্রাজ্ঞী হরকো।

খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে জাপান একটি সাম্রাজ্যে পরিগণিত। বর্ত্তমান সম্রাটের নাম মুৎসুহাইট এবং তাঁহার পত্নীর নাম হরকো। ইতিপূর্ব্বে

১২০টী সম্রাট্ জাপানে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু জাপান ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এখনকার মত প্রতাপান্বিত ও সমৃদ্ধিশালী হয় নাই। পূর্ব্বতন জাপানিয়া সম্রাটদিগেরই গৌরব করিত, সম্রাট-পত্নীদিগকে গণনা-স্থলে আনিত না। বর্ত্তমান সাম্রাজ্ঞী জাপান-সম্রাটের যথার্থ সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী ও সহচারিণী হইয়াছেন। তিনি সম্রাটের সহিত এক টেবিলে বসিয়া ভোজন করেন এবং রাজসভায় মন্ত্রীর ন্যায় পরামর্শ দান করেন। সম্রাট ১৬ বৎসর বয়সে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং ১৭ বৎসর বয়সে দারপরিগ্রহ করেন। দম্পতী উভয়ে একমনে ও একপ্রাণে পরিশ্রম করিয়া যেমন জাতীয় জীবনের অত্যুন্নতি সাধন করিয়াছেন, তেমনি রাজসভাকেও সুগঠিত ও প্রভূত শক্তিশালিনী করিয়াছেন। ৩০ বৎসর হইল ইঁহাদের শুভ বিবাহ হইয়াছে। ইতিমধ্যে একটি পুত্র ও চারিটি কন্যা ইঁহাদের অঙ্ক সুশোভিত করিয়াছে। সাম্রাজ্ঞী অশ্বারোহণ ও ব্যায়াম ক্রীড়ায় বিশেষ পটু। রাজধানী টোকিওর প্রাসাদে তাঁহার জন্য একটী ব্যায়াম-শালা নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজ্ঞী পারিবারিক ও সামাজিক সকল বিষয়ে সম্রাটকে এরূপ পরিতুষ্ট করিয়াছেন যে সম্রাট্ অসংখ্য কবিতা উপহারে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন। গত নবেম্বরের শেষ সপ্তাহে যখন তিনি শকটারোহণে রাজপথে ভ্রমণ করেন, তখন তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এক পাগল তাঁহার গাড়ীর মধ্যে বোম ছুড়িয়াছিল বলিয়া আতঙ্ক হয়, কিন্তু বোমের পরিবর্ত্তে কাঠের পুতুল দেখিয়া ভয় দূর হয়। সাম্রাজ্ঞী পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রণালীতে সমাজসংস্কারে অত্যন্ত অনুরাগিণী। তাঁহার স্বামী এ বিষয়ে উৎসাহদাতা। জাপানী সুন্দরীরা জযুগ কামাইয়া এবং দশন রঞ্জিত করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেন। সাম্রাজ্ঞীর দৃষ্টান্তে ও প্রভাবে এই অসভ্য প্রথা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। তাঁহারই পৃষ্ঠ-পোষকতায় টোকিওতে স্ত্রীলোকদের জন্য একটী হাঁসপাতাল হইয়াছে এবং তাহার কার্য্য সুন্দররূপে চলিতেছে। তিনি ইংলণ্ডের যুবরাজ-পত্নীকে আদর্শ রমণী বলিয়া মনে করেন এবং জাপান রমণীদিগকে ইংরাজ ভামিনী-দিগের অনুরূপ দেখিতে চান। জাপানের প্রাচ্যভাব রক্ষা পাওয়া ভার।

মৃত্যুবৎ মূর্চ্ছা।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্সের অন্তঃপাতী ইষ্ট সেণ্ট লুইস প্রদেশে ক্রিশ্চিনা হার্ট নামে একটী স্ত্রীলোক দীর্ঘকাল পীড়িত থাকিয়া একদিন মৃতকল্প বোধ হইল। চিকিৎসক আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বলিলেন সব শেষ হইয়া

গিয়াছে। পরিবারের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলে শোকে অস্থির, ক্রমে সমাধির আয়োজন হইতে লাগিল। বাহ্যিক মৃত্যু লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হইলেও, রোগী জ্ঞানশূন্য হন নাই। তিনি সমস্ত শ্রবণ এবং যাহা ঘটিতেছিল অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রে তাহা দর্শন করিতেছিলেন। শরীর পক্ষাঘাতের ন্যায় অসাড়, বহু চেষ্টা করিয়াও জিহ্বা বা ওষ্ঠ নাড়িতে সমর্থ হইলেন না। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া তখনকার অবস্থা এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন:—"আমাকে মৃত বোধে সকলে শোক করিতে ও সমাধির জন্য আয়োজন করিতে লাগিল। স্বামী শিয়রে বসিয়া একদৃষ্টে আমার মুখপানে চাহিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষের জল আমার উপর পতিত হইতে লাগিল ; মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, কিন্তু একটীও বাঙ্‌ নিষ্পত্তি করিতে পারিলাম না, চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত, তাহাতে নিমেষ ছিল না, বোধ হয় বিবর্ণও হইয়াছিল, তাই জীবিত বলিয়া অনুভূত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে যাহা কিছু প্রতিফলিত হইত, তৎসমুদয় দর্শন করিতে পারিতাম। জ্ঞান সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হওয়াতে ধারণা-শক্তির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। যখন আমাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া অন্ধকার গৃহে একাকী ফেলিয়া সকলে চলিয়া গেল, তখনকার ভয়ানক অবস্থা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ পরেই শব-বাহকেরা আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাদিগের অধ্যক্ষ গৃহমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি অপসারিত করিয়া শয্যাসহ আমাকে গৃহের মধ্যস্থলে টানিয়া আনিল। যখন সে তাহার শীতল কঠিন হস্ত দ্বারা আমার অঙ্গস্পর্শ করিল, তখন মনে এক বিষম যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, কিন্তু কোন প্রকারে তাহা ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইলাম না। শব রক্ষার জন্য আরোক (ঔষধ বিশেষ) এবং তাহা শরীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিবার যন্ত্র সকল আনিয়া ক্রমে ক্রমে আমার শয্যার পার্শ্বে সাজাইয়া রাখিল। আরোকের সঙ্গে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল এবং মুহূর্ত্তকাল সংজ্ঞাশূন্য হইলাম। পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে শিরায় মধ্যে বিষ ঢালিয়া দিবে বুঝিতে পারিয়া বিষম ব্যাকুল হইলাম, অনেক চেষ্টা করিয়াও মুখ ফুটিতে পারিলাম না। সামান্য শব্দ কিম্বা অস্ফুট চুপি কথাও শুনিতে পাইলাম, অর্দ্ধমুদ্রিত নয়নে যাহা কিছু প্রতিফলিত হইত, তাহাই দেখিতে বা চিনিতে পারিতাম। হঠাৎ সেই সময় শববাহক উঠিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল, দেখিয়া আমার যন্ত্রণার অনেকটা উপশম হইল, কিন্তু মনো-ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য অত্যন্ত যত্নাতিশয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। নিরুপায় অবস্থায় উৎকণ্ঠায় হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল, এবং কি করিলে যে রক্ষা পাইব কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। এমন সময় শববাহক আরও কয়েকজন লোক লইয়া পুনর্ব্বার আসিয়া উপস্থিত

হইল এবং একবারে তাহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। যন্ত্রগুলি পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে আলোক ঢালিয়া আমার মুখাবরণ অপসারিত করিল, তদনন্তর তাহার বাহুদ্বারা আমার অঙ্গবেষ্টন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া তুলিল এবং একখানি শীতল মসৃণ তক্তায় শোয়াইয়া যন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক শরীরমধ্যে আলোক প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। তখনকার অবস্থা মনে পড়িলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। শববাহকের কঠোর পীড়নে মর্ম্মগ্রন্থি সকল যেন শিথিল হইয়া গেল। সহসা চক্ষু স্ফুটিত হইল এবং জিহ্বার জড়তা অপসারিত হইল—যেন মুখের চাবি খুলিয়া গেল। আমি সহসা চীৎকার করিয়া বলিলাম "ওগো আমি সমস্ত দেখিতেছি ও জানিতেছি, কোথায় আমাকে জীবিতাবস্থায় কবরসাৎ করিতে লইয়া যাইতেছ? আমি মরি নাই।" বলিতে বলিতে আমার শরীরের জাড্য দূরীভূত হইল। আমি পূর্ব্বের ন্যায় স্বচ্ছন্দ বোধ করিলাম। সহসা শয্যা হইতে দাঁড়াইয়া উঠিলাম এবং পাগলের ন্যায় গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য যে তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া পরিবারের আর আনন্দের সীমা রহিল না। কুসংস্কারাপন্ন লোক হইলে "দানা পাইয়াছে" বলিয়া হয়ত জীবন্ত ব্যক্তির নিগ্রহের পরিসীমা রাখিত না। এ দেশে চিতায় হইয়া অগ্নিস্পর্শে কাহার কাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়াছে, এমন গল্প অনেক শুনা গিয়াছে। কিন্তু সৎকারকারীরা তাহাকে "দানা পাওয়া" বিবেচনা করিয়া কোদাল কুড়ালীর আঘাতে মারিয়া ফেলিয়া শব জ্বালাইয়া দিয়াছে। অল্প দিন হইল কলিকাতা মানিকতলায় একটী স্ত্রীলোককে কবর দিতে আনা হইয়াছিল, কবর খননও করা হইয়াছিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অর্থাৎ কবরসাৎ করিবার অব্যবহিতপূর্ব্বে নমাজের সময় তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। সে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিল এবং তদবস্থায় তথায় আনীত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। লজ্জিত পরিজনেরা মিথ্যা কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া গেল।

ভক্ত বিল্বমঙ্গল।

(৪৩০-৩১ সংখ্যা—২৩৫ পৃষ্ঠার পর)

সতীর সতীত্ব।

সন্ন্যাসিবেশী বিল্বমঙ্গল যখন গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন গৃহস্থের আনন্দের আর সীমা রহিল না। হিন্দুর নিকট "সর্ব্বদেবময়োঽতিথি।" আজ তাঁহার গৃহে অতিথি উপস্থিত, অতিথির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবেন, প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করিবেন, এই কথা ভাবিয়া আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। গৃহস্থ বিল্বমঙ্গলকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য

বিনীত ভাবে অগ্রসর হইলেন এবং বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন।

বিল্বমঙ্গল বসিলেন না, গৃহস্থের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, কেবল অন্যমনস্ক-ভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি যতই সেই রমণীর সৌন্দর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তিম-বর্ণ এবং কপাল ঘর্ম্মাক্ত হইতে লাগিল। গৃহস্থ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অভ্য-র্থনায় বোধ হয় কোন প্রকার ত্রুটি হইয়াছে, সেই জন্য অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বিল্ব মঙ্গল অনেক ক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ কাহারও দোষ নয়, আমার বিকৃত মস্তিষ্কেরই দোষ।"

গৃহস্থ কথার মর্ম্মভেদ করিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, তাঁহাকে উপহাস করিবার জন্য বিল্বমঙ্গল এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন। অতিথিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না বলিয়া গৃহস্থ নিতান্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলেন। বারম্বার কাতরবচনে তাঁহাকে আসন গ্রহণের জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আপনি অতিথি পরম গুরু। আপনি কি চান্ বলুন, তাই দিব।"

বিল্বমঙ্গল পাপী হইলেও বড় সরল ...র লোক ছিলেন। সেই সময়ে ...ীর প্রতি তাঁহার হৃদয়ের অনুরাগ ...হইয়া উঠিতেছে। তিনি আর ...থাকিতে না পারিয়া আপনার ...া স্পষ্ট ভাবে গৃহস্থের নিকট ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। অতিথির মুখে এরূপ ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া গৃহস্থের মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি দুই কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন; কারণ গৃহস্থের স্ত্রী পরমা সাধ্বী ও পতিগত-প্রাণা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ কঠোর কথা শ্রবণ করিতে হইল। আন্তরিকবেদনায় অস্থির হইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয় এবং বিষণ্ণ মুখ-মণ্ডল লইয়া গৃহস্থ আপনার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সাধ্বী সতী পতিমুখে বিষণ্ণভাব দর্শন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহস্থ অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে বিল্বমঙ্গলের অসৎ অভিলাষের বিষয় প্রকাশ করিলেন। গৃহস্থ বলিলেন, "আমি সম্প্রতি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াছি। একদিকে অতিথিকে ফিরাইয়া দিলে মহা অপরাধ হইবে, আমার ব্রত ভঙ্গ হইবে, ধর্ম্মকর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হইবে—আবার অন্য দিকে তোমার সতীত্ব রক্ষা। আমি কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার বুদ্ধিবৃত্তি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।"

গৃহস্থ-পত্নী বিনীত ভাবে বলিলেন "স্বামিন্! আপনি বৃথা কেন ভয় করিতে-ছেন? যে দয়াময় পরমেশ্বর সকলকে রক্ষা করিতেছেন, সেই প্রভু আসন্ন বিপদ্ হইতে আমাদিগকেও রক্ষা করি-বেন। আমার যদি বাস্তবিক সতীত্ব থাকে এবং পরমেশ্বরের চরণে অচলা ভক্তি থাকে, তবে আমায় কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। ধর্ম্মের জয় হইবেই—আপনি

অতিথিকে বলুন আমি রজনীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

গৃহিণী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। এই জন্য পত্নীর কথায় গৃহস্থের বিশ্বাস হইল। পত্নীর মুখে আশাজনক বচন শ্রবণ করিয়া তিনি ধৈর্য্যধারণ করিলেন এবং পত্নীর সম্মতিক্রমে বিল্বমঙ্গলকে আনাইয়া পান ভোজন করাইলেন। বিল্বমঙ্গল গৃহস্থের কথায় আশ্বস্ত হইয়া ধৈর্য্য ধারণ করিলেন এবং ব্যগ্র ভাবে রজনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহস্থ সমস্ত দিবস বিল্বমঙ্গলের সহিত ধর্ম্মালাপ এবং শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে শিষ্টবচন, মিষ্টালাপ এবং শাস্ত্রবিষয়ক কথোপকথনে সমস্ত দিবস অতীত হইল। ক্রমে রজনীর নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবীর মুখ আবৃত হইল, বিষম অগ্নি-পরীক্ষার সময়ও উপস্থিত হইল। আজ গৃহস্থের গৃহে কি ঘটিবে জানিবার জন্য চন্দ্রমা আকাশে ব্যগ্রভাবে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, ছোট ছোট তারাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু মিট্‌ মিট্‌ করিয়া গৃহস্থের গৃহের উপরে আগ্রহে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, অতসন্ধিৎসু শৃগাল চীৎকার পূর্ব্বক কয়েক বার জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল 'ক্যা হুয়া, ক্যা হুয়া'। সন্দিগ্ধমনা গৃহস্থের প্রাণও অবিরত কি হয় কি হয় ভাবিয়া চমকিয়া উঠিতেছে। আচ্ছা পাঠকবৃন্দ! একবার দেখা যাউক্ অতঃপর কি হয়।

বিল্বমঙ্গল গৃহস্থ-রমণীর অপেক্ষা করিতেছেন। গৃহস্থ-পত্নী অবগুণ্ঠনে সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিল্বমঙ্গল অবগুণ্ঠন মোচন করিতে রমণীকে বারংবার অনুরোধ করায় রমণী মুখের আবরণ মোচন করিলেন। বিল্বমঙ্গল সমস্ত দিবস গৃহস্বামীর সহিত কথোপকথন করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্মভাব দর্শনে তাঁহার মন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে গৃহস্থ-পত্নীর ধর্ম্মভাবপূর্ণ সরল মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত একেবারে নির্ব্বিকার ভাব প্রাপ্ত হইল। তাঁহার প্রাণে বিষম অনুতাপের অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, হৃদয় হইতে সমস্ত অপবিত্রতা দগ্ধ হইয়া গেল। বিল্বমঙ্গল বেগে গৃহস্থপত্নীর পদতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন "মাতঃ! আমায় ক্ষমা করুন। আমি মহাপাপী, ঘোর অপরাধী। আমি আর আপনার দিকে চাহিতে পারিতেছি না। আপনার শরীর হইতে শত সূর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোতি বাহির হইতেছে, আমার শরীর মন প্রাণকে দগ্ধ করিতেছে।"

গৃহস্থ-পত্নী মৃদু মধুর স্বরে বলি[illegible] "আপনি আমায় কি কার্য্যসাধনে[illegible] ডাকিয়াছিলেন, অনুমতি করুন।" [illegible]মঙ্গল অতিশয় কাতরকণ্ঠে ব[illegible] "হতভাগ্য আমি, নরকের কীট[illegible] আপনি পবিত্রচরিত্রা দেবী। আপ[illegible]

আর আমি কি বলিব? আমায় এই মুহূর্ত্তে একটী স্থচী ও এক গুচ্ছ সূত্র আনিয়া দিন। আপনাকে আর কিছু করিতে হইবে না।” গৃহস্থ-পত্নী কক্ষান্তরে গমন-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ একটী স্থচী ও এক গুচ্ছ সূত্র আনিলেন। বিল্বমঙ্গলের হস্তে প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এক্ষণে আর কি কার্য্য করিতে হইবে অনুমতি করুন্।” বিল্বমঙ্গল বলিলেন "মা আর কিছু করিতে হইবে না। আপনি এখন সচ্ছন্দে আপনার পতির নিকট গমন করুন।” গৃহস্থ-পত্নী বিল্বমঙ্গলের নিকট বিদায় লইয়া আপনার পতির সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট বর্ণন করিলেন। সতী এবং পতি একত্রিত হইয়া করযোড়ে সর্ব্ববিঘ্নহারী পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ধন্য সতীর সতীত্ব! ধন্য গৃহস্থের অতিথি-সৎকার-বাসনা!!

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

এদিকে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় অনুতাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে লাগিল, অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ভাসিয়া গেল, তিনি হৃদয়ের যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। ভাল হইবেন সঙ্কল্প করিয়া একবার গৃহদ্বার পরিত্যাগ করিলেন, চিন্তামণিকে ছাড়িলেন, সুখভোগ ও ইন্দ্রিয়লালসায় বিসর্জ্জন দিলেন, বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন; কিন্তু হায়! এত করিয়াও, প্রবাসে আসিয়াও এখানে আবার তাঁহার শোচনীয় অধঃপতন হইল। এই কথা যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার আন্তরিক বেদনা তীব্র হইতে তীব্রতর এবং অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিল। বাস্তবিক যাহারা ভাল হইবার ইচ্ছা করিয়াও ভাল হইতে না পারে, আত্ম-দুর্ব্বলতাবশতঃ লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে না পারে, তাহাদের মনে যে কিরূপ তীব্র যাতনা উপস্থিত হয়, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর লোকে বুঝিতে পারিবে না। বিল্বমঙ্গলের ভাগ্যেও এই দুরবস্থা ঘটিল।

অবশেষে বিল্বমঙ্গল ভাল হইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিলেন "আমি ভাল হইবার ইচ্ছা চিরদিন করিয়াছি। কিন্তু আমার এই পাপিষ্ঠ চক্ষু আমায় চিরদিন বঞ্চিত করিয়াছে। এই চক্ষু আমায় চিন্তামণির নিকটে দাসত্ব বন্ধনে বান্ধিয়াছে, এই চক্ষু পুষ্করিণীর তটে এই সাধ্বী সতীকে কুভাবে দেখিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই চক্ষু সকল অনর্থের মূল, এই চক্ষু সকল পাপ এবং প্রলোভনের উৎসাহদাতা, অতএব এই চক্ষু আর রাখিব না।” এই কথা বলিতে বলিতে বিল্বমঙ্গল চক্ষু দুটীর তারা স্থচী-বিদ্ধ করিলেন এবং একটী একটী করিয়া আপনার চক্ষু দুটীর কপাট-দ্বয়কে এক হস্তে আকর্ষণ পূর্ব্বক অন্য হস্ত দ্বারা সিলাই করিয়া দিলেন। অহো! কি ভয়ানক!!

পাঠক! বিল্বমঙ্গলের এই শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিলে এমন কে পাষাণ-হৃদয় আছে, যাহার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু অশ্রুবারি পতিত না হইবে?

এক দিকে বিল্বমঙ্গলের হৃদয় অনুতাপের তীব্র অগ্নিতে প্রজ্বলিত হইতেছে, হৃৎপিণ্ড গলিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুবারি-রূপে দুই চক্ষু দিয়া ঝরিতেছে; আবার দেখ, অন্য দিকে বিল্বমঙ্গল আপনার পাপের জন্য আপনাকে কঠোর শাস্তি দিতেছেন, সূচীদ্বারা আপনার চক্ষুর্দ্বয়কে অন্ধ করিয়া দিতেছেন। শোণিতের স্রোত ও অশ্রুজলের স্রোত উভয় স্রোত একত্রে প্রবাহিত ও সম্মিলিত হইয়া বিল্বমঙ্গলের গণ্ডদেশ ও বক্ষোদেশ প্লাবিত করিতেছে। বিল্বমঙ্গলের জীবনের এই লোমহর্ষণ কাণ্ড স্মরণ করিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় স্তম্ভিত হয়, বিল্ব-মঙ্গলের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

"এত বার মানা করিলাম তবু শুনিলে না" ?

"না আমি শুনিতে পারিব না।"

"স্বামীর প্রতি আজ কালকার মেয়ে-দের এই ভক্তি" ?

"তেমন ভক্তির পাত্র হলেত" ?

"তবে তুমি আমায় ভালবাস না?"

"না আমি তোমায় ভালবাসি না"।

"তবে এত দিন? এ সব মিথ্যা" ?

"হাঁ সব মিথ্যা"।

"সত্য বলিতেছ ভালবাস না" ?

হাঁ আমি সত্য বলিতেছি তোমায় ভাল-বাসি না।"

"বেশ।"

কলিকাতার একটি ত্রিতল অট্টালিকার এক শয়ন-প্রকোষ্ঠের গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া স্বামী ও স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। নীরদচন্দ্র বসু এই সবে মাত্র 'বি এল' পাশ করিয়া কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী উষাময়ীকে তিনি আজি কালকার নব্য শিক্ষিত যুবকদিগের মত গঙ্গাস্নানে যাইতে মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু উষা তাহা বার বার অবহেলা করিত। সে পিতা মাতার আদরের একটী মাত্র কন্যা। পিতার ঐশ্বর্য্যে, মাতার অত্যধিক স্নেহে সে প্রতি-পালিত হইয়া আসিয়াছে। নীরদচন্দ্র দরিদ্রের সন্তান, শৈশবেই পিতৃহীন হইয়া-ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি পল্লীগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া প্রাইভেট টিউটারি (বাড়ীতে গিয়া ছেলে পড়ান) করিতেন ও মেসে (ছাত্রাবাসে) থাকিয়া ইউনিভারসিটিতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তখন অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এমন গুণবান্ বিদ্বান্ জামাতৃ-রত্ন লাভ করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। উমাকান্ত দত্ত কলিকাতার একজন জানিত লোক। তিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজ-সরকারে একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। উপরওয়ালাদিগের

সহিত মনান্তর হওয়ায়, স্বেচ্ছায় সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ব্যবসা চালাইতেছেন। ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এখন তাঁহার আফিস ও কারখানার নাম খুব। তাঁহার কয়েকটি সন্তান মারা যাইবার পর উষা জন্মিয়াছিল, সেই জন্য সে বড় আদরের মেয়ে। উষার পর আর একটি মাত্র পুত্র বাঁচিয়াছিল, তাহার নাম কিরণচন্দ্র। নীরদচন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভাগ্য সেই উষাময়ীর অদৃষ্টসূত্রে একত্রে গ্রথিত ছিল। উমাকান্ত বাবুর কোনও পাত্র মনোনীত হয় নাই, কিন্তু নীরদ-চন্দ্রকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে পুত্রস্নেহ জন্মিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই একটি সুশীল সচ্চরিত্র ছাত্রের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ঈশ্বরের শুভানুগ্রহে তিনি নীরদচন্দ্রকে পাইয়া, তাহাকে কন্যাদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। অনেকেই এই দরিদ্র সন্তানের সহিত বিবাহে পরামর্শ দেয় নাই। কিন্তু উমাকান্ত বাবু যাহার তাহার পরামর্শে চলিবার পাত্র ছিলেন না।

বিবাহের পর তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। নীরদচন্দ্র সেই অবধি শ্বশুরালয়ে বাস করিতেছেন। তিনি উমাকান্ত বাবুর স্নেহাদরে শ্বশ্রূঠাকুরাণীর যত্ন ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার পিতা মাতার অভাব তাঁহাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। বিবাহের দিন শুভদৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনার বিমল হৃদয় একেবারে উষাময়ীকে সঁপিয়া দিলেন। তাঁহাকে ভালবাসিবার—আপনার করি-বার কেহ ছিল না। মানব জীবনে যে সময় আপনা হারাইয়া সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিবার বাসনা প্রবল হয়, সেই সময় নীরদচন্দ্রের চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্তিমতী প্রীতিরূপিণী উষাময়ী আসিয়া দাঁড়াইল। নীরদচন্দ্র তার পর সেই বালিকাকে আপনার মনের মত করিবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু উষাকে তিনি কোন রূপে বুঝিতে পারিতেন না। সে দুরন্ত পনির মত কোনরূপে বাগ মানিত না। সে চিরকালই পিতা মাতার আদরে লালিত হইয়া আপনার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিত। নীরদ চন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া তাহাকে নিজে শিক্ষাদান করিবার সময় নিরূপিত করিয়াছিলেন। সে বলিত তাহার পড়া ভাল লাগে না; হয়ত কোন দিন পড়িত, কোন দিন বই লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত। তখন সে দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকা মাত্র ছিল, তাহার সেই গর্ব্বিত সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া নীরদ চন্দ্র সকলি ভুলিয়া যাইতেন।

এখন সে প্রকারে আর দিন চলে না। নীরদ চন্দ্র আপনার জিদ বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইতেন, অন্ততঃ তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী কর্ম্ম করাইতেন। ইহাতে হিতে বিপরীত হইল। উষা ক্রমাগত স্বামীর অমতে নানা কাজ করিয়া বসিত। ক্রমে উভয়ের জিদ উভয়ে বজায় রাখিতে গিয়া বিবাদের সূত্রপাত হইত। উষা কথা বন্ধ করিত, কখনো বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার জর

হইত। অদ্য স্বামী স্ত্রীতে পুনরায় বিবাদ বাধিয়াছে। সে দিন সংক্রান্তি ছিল, উষার মাতা গঙ্গা স্নানে যাইবার সময় উষাকে লুকাইয়া লইয়া গিয়াছিল। বৈকালে নীরদ চন্দ্র তাঁহার একজন বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন, তিনি যাইবা মাত্র তাঁহার বন্ধু উপহাসচ্ছলে কহিলেন :—

"কি গো নীরদ বাবু স্ত্রী-বশীকরণের মন্ত্রের বুঝি এই গুণ? তবে আজ আবার কেন গঙ্গা স্নানে পাঠাইয়াছিলে"?

"কে বলিল?"

"কে আর বলিবে? স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগেশ বিপিনকেও জিজ্ঞাসা করিও, তারাও দেখিয়াছে"।

"কি করিয়া দেখিলে"?

"কেন চক্ষু দিয়া দেখিলাম, দেখা আবার কিসে হয়"?

"তোমরাও গিয়াছিলে নাকি"?

"হাঁ মশায়, নহিলে দেখিলাম কি করিয়া? নিমতলার ঘাটে আমরা যোগেশের বাড়ীতে গিয়াছিলাম, আমি প্রথমে অত লক্ষ্য করি নাই, বিপিন দেখাইয়া দিল, উমাকান্ত বাবুর গাড়ীর নিকটে তোমার উষা সুন্দরী পথ আলো করিয়া, মাথার কাপড় খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমরা মজা করিবার জন্য কিছু দূরে, কিন্তু ঠিক সমুখে দাঁড়াইয়া চাহিয়া ছিলাম। সহসা আমাদের দেখিয়াই এক হাত ঘোমটা টানিয়াই গাড়ীতে প্রবেশ। কেমন মজা, তুমি না বলিয়াছিলে উষা কখনো গঙ্গা স্নানে যায় না?"

তাই সন্ধ্যা-ভ্রমণের পর গৃহে আসিয়াই নীরদ উষাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রোষে অপমানে, লজ্জায় অভিমানে নীরদ চন্দ্রের হৃদয়ে এক বিষম তুফান উঠিয়াছিল। তাঁহার আরক্তিম মুখে ভ্রূকুটি-কুঞ্চিত চক্ষু দেখিয়া, উষা নিজেকে অন্যায় রূপে অপমানিত জ্ঞান করিল। নীরদ উষাকে কঠিন ক্রোধব্যঞ্জক স্বরে কয়েকটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিলেন। উষাও ক্রোধে অভিমানে আত্মহারা হইয়া সমান উত্তর দিয়া বসিল। মুহূর্ত্তের সেই বিবাদে উভয়ের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়া গেল। তাহারা কি করিবে? অলক্ষ্যের কোন হস্তে, অদৃষ্টের কোন ঘটনা-চক্রে মনুষ্যের জীবনে এই প্রকার ঘটিয়া থাকে; তাহা যদি মনুষ্য বুঝিতে বা পড়িতে পারিত, তাহা হইলে অদৃষ্ট অদৃষ্ট থাকিত না। উষার নিকট সেই প্রকার কঠিন উত্তর পাইয়া, নীরদচন্দ্র "বেশ" বলিয়া কিয়ৎক্ষণ সেই গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

সে দিন রাত্রে নীরদ আর শয়নকক্ষে শয়ন করিতে আসিলেন না। অন্য কেহই জানিল না। সারারাত উষা অনিদ্র-ভাবে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় কাটাইল। তাহার জীবনে এই প্রকার ঘটনা এই প্রথম। সে কত বার স্বামীর সহিত অকারণে বিবাদ করিয়াছে, শক্ত কথা বলিয়াছে, কখনো তাহার পরিণাম

এ প্রকার হয় নাই। তাই আজ স্বামীকে কঠিন কথা বলিয়া অনুতাপে তাহার হৃদয় পুড়িতেছিল। অথচ সহসা স্বামীর নিকট হইতে অকারণে শক্ত কথা শুনিয়া অভিমানে আত্মহারা হইতেছিল, ভাবিতেছিল "গঙ্গা-স্নানে গিয়াছিলাম, এই ত আর কিছু নয়। কই বাবা ত মাকে কখনো মানা করেন না"। এই প্রকার নানা যুক্তি তর্কে ও চিন্তায় রাত্রি প্রভাত হইল।

পরদিন প্রভাতে উমাকান্ত বাবু শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবার পরেই দেখিলেন, নীরদচন্দ্র বাহির বাটীর বৈটকখানায় বসিয়া আপনার পোর্টম্যাণ্ট সজ্জিত করিতেছেন। তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি নীরদ! কোথা যাইতেছ"?

"এত দিন বেড়াইতে যাব ভাবিতেছিলাম, তাত এতদিনেও হইল না; তাই একবার পশ্চিম বেড়াইতে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি।"

"আজই যাইবে বুঝি"?

"তাইত স্থির করিয়াছি। আর এক-জামিনেরও সংবাদ বাহির হইয়াছে, এখনত বসিয়া থাকিলে চলিবে না। এক স্থানেত প্র্যাক্টিস করিতে হইবে।

"কেন কলিকাতায় কি প্র্যাক্টিস করিবে না"?

"কলিকাতায় সেরূপ পসারের আশা কই? আর আজ কাল ত দেখিতেছেন অলি গলিতে উকিল।

"এত শীঘ্র কেন যাইতেছ?"

"একবার দেশভ্রমণ করিতে গিয়া দেখিয়া আসি কোথায় পসার জমিবার আশা আছে। ঘরে বসিয়া থাকিলে ত চলিবে না"।

"তাত সত্যই"।

উমাকান্ত বাবু কার্য্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন, জামাতার ভবিষ্যতের পথ অন্ধকার করিলেন না, যাইতে সানন্দে অনুমতি দিলেন।

উষা যখন শুনিল নীরদ সেই দিন বিদেশে যাইতেছেন, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। তখন সে বুঝিল যে নিজের দোষে সে নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কেহ কিছু জানিল না, বা সন্দেহ করিল না; কিন্তু সে বুঝিতে পারিল কি কারণে নীরদ বিদেশে যাইতেছেন। সে দিন দিনের বেলায় আর নীরদ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন না। সকাল হইতে বন্ধু বান্ধব দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে, আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনিতে এবং গৃহে আসিয়া প্যাক করিতে করিতে সে দিন কাটিয়া গেল। মেল ট্রেণেই যাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর উষার মা জামাই বিদেশে যাইতেছেন এই ভাবিয়া নীরদের আহারের স্থান উষার শয়নকক্ষেই করাইয়াছিলেন। আহার প্রস্তুত হইলে কিরণ আসিয়া নীরদকে ডাকিয়া লইয়া গেল।

আহারের সময় কিরণ সেই স্থানে বসিয়া জামাই বাবুর সহিত নানাবিধ গল্প ও প্রশ্ন করিতে লাগিল, সহসা জননীর আহ্বানে নীচে নামিয়া যাইতে বাধ্য হইল। আহার শেষ হইলে উষা পানদের

পাশ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বহস্ত-রচিত তাম্বুল আনিয়া দিল। নীরদ অন্য দিকে ফিরিয়াছিলেন, দেখিতে পাইলেন না। কম্পিতকণ্ঠে নয়নের উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া উষা কহিল "এই পান নেও"।

নীরদ উষার প্রতি ফিরিয়া চাহিলেন। মানসিক যন্ত্রণায় তাঁহার সে হাস্য-প্রফুল্ল আনন গম্ভীর ও বিষাদের ছায়ায় মলিন হইয়াছিল। তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর-কণ্ঠে কহিলেন "উষা! আমি চলিলাম, কেন যাইতেছি তাহার কারণ আর তোমায় বলিতে হইবে না। তুমি আজ হইতে মনে করিও যে তোমার স্বামী নাই। যে স্ত্রী তাহার স্বামীকে ভালবাসে না, তাহার স্বামী থাকা না থাকা সমান।" উষা একবার মুখ তুলিয়া চাহিল, উভয়ের দৃষ্টি উভয়ের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। তখন উভয়ের মনের ভাব কি হইয়াছিল, তাহা কে জানে? অতি মৃদুস্বরে উষা জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন তুমি কি এখন আর আসিবে না?

"কেন আসিব? কাহার জন্য আসিব? আমার আর আপনার কে আছে যে আসিব?" লজ্জায় অভিমানে উষার হৃদয় ফাটিয়া যাইবার মত হইল। চক্ষের অশ্রু-জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে নীরবে ধরণী পানে চাহিয়া রহিল।

নীরদ পুনরায় স্থিরস্বরে কহিলেন—

"আমার যাওয়াতেই তোমার মঙ্গল। তুমি তোমার বাপ মায়ের আদরের মেয়ে, আমি গেলে স্বেচ্ছায় সকল কাজ করিতে পারিবে, কেহই আর বাধা দিয়া তোমার মনঃকষ্টের কারণ হইবে না। আমি তোমার বাবাকে বলিয়াছি যে দেশভ্রমণে যাইতেছি, আসল কথা আমি এই জন্মের শোধ চলিলাম। আমার কথা তুমি একবারও মনে করিও না। এখন তবে চলিলাম।"

উষা তাহার আনত মুখ তুলিয়া চাহিল; প্রদীপের ম্লান আলোকে নীরদ দেখিলেন না যে সে মুখ অশ্রুধারে ভাসিয়া যাইতেছে—অন্তরের আকুল বেদনা তাহাতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ধবিশ্বাস ও অভিমানে আত্মহারা হইয়া নীরদচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

৩

"কি গো! নীরদ এখনো আসিল না কেন? তোমায় শেষ চিটি কত দিন হল দিয়েছে? উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেও বলে 'হাঁ চিটী এসেছে।'"

"কেন আমারও প্রায়ই চিটি লেখে, এই সেদিন একটা কার্ড পেয়েছি, তাতে লিখেছে কাজের বড় ভিড়, বেশ ভাল আছে। কেন উষাকে কি চিটিপত্র দেয় না? সেই যে নীরদচন্দ্র বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, এখনো কি ফিরিয়া আসেন নাই? তাঁহার যাওয়ার পর প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিল।"

এক দিন সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা ও গৃহিণীতে এই প্রকার কথোপকথন হইতেছিল। গৃহিণী বারান্দায় বসিয়াছিলেন, কর্ত্তা একটি

মোড়ার উপর বসিয়াছিলেন। গৃহিণী পুনরায় কহিলেন—

"উষা ত শুকিয়ে যাচ্ছে। সেই যে জ্বর থেকে উঠেছে, কই এ পর্য্যন্ত আর ত গায়ে সারছে না। আমার বড় ভাবনা হয়েছে, জামাই বাড়ী না এলে আর আমি স্থির হতে পাচ্ছিনে।"

"এই না সেদিন উমেশ বাবু লিখে-ছিলেন, লাহোরে নীরদ এরি মধ্যে বেশ পশার জমিয়েছে। এই কয় মাসের মধ্যেই বাড়ীখানা কিনেছে। এ সময়ে আসলে চলবে কেন?"

"পূজার সময় অনায়াসে আসতে পার্ত্ত।"

"তা ও ত তোমায় বলেছিলুম, সেখানে তারা কয়েক জন বন্ধুতে মিলে সে সময় কাশ্মীরে বেড়াতে গিয়েছিল"।

"হাঁ গা তা উষাকে কেন নিয়ে যাবার কথা লিখ্‌ছে না? সে না লিখুক, তুমিও ত ওকে গিয়ে রেখে আসতে পার?"

"হাঁ, আমিও তাই কদিন ধরে ভাবছি, আচ্ছা ওদের ভিতরে কোন রকম মনান্তর হয় নাই ত?"

"তা আমি কি করে জানব বল? তবে বিধু ঝি বল্‌ছিল যাবার সময় নাকি জামাই বলে গেলেন "আর আমি আস্‌ব না, এই জন্মের মত চলিলাম"।

"বিধু আবার কি প্রকারে শুনিল"?

"সে উপরে সকড়ি তুলতে গিয়েছিল, জামাইয়ের খাবার ঠাঁই সেদিন উষার ঘরেই হয়েছিল।"

"তা আমায় এত দিন বল নাই কেন"?

"আমি সে কথায় ভেবেছিলুম কি শুন্‌তে কি শুনেছে।"

"আচ্ছা, তুমি বেশ করে দেখো দেখি যে উষা চিটি পত্র লেখে কিনা। দাসী-দের বলে দিও কোন চিটি পত্র ডাকে ফেল্‌তে দিলে আগে যেন আমায় দেখিয়ে নে যায়। আমিও ডাক পিয়নকে বলে দেব আমার হাতে ছাড়া অন্য কাকেও চিটি দেবে না। তা হলেই জানা যাবে নীরদ চিটি পত্র দেয় কিনা, তার পর যা করবার তা কর্ত্তে হবে।"

এক মাস অতীত হইবার পর, যখন কর্ত্তা ও গৃহিণী স্থির জানিলেন কোনও চিটি পত্র আসে না, তখন তাঁহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। একমাত্র আদরের কন্যা, সে যদি স্বামি-প্রেমে বঞ্চিতা হয়ত তাহার অধিক আর কোন্ দুঃখ আছে? উষার মা সে কালের ধরণের ছিলেন, তিনি স্বামীর সেবাই সার ধর্ম্ম জানিতেন, এবং স্বামীকে ইষ্ট দেবতা জানিয়া সর্ব্বদাই স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। উষার জন্য তিনি অতিশয় চিন্তিতা হই-লেন। উষার অন্যায় অভিমান ও কঠিন কথায় হয়ত জামাই রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, এই ভাবনাই তাঁহার মনে প্রবল হইল! একদিন তিনি নীরবে স্বামীকে না বলিয়া, নিঃশব্দে উষার শয়ন-কক্ষে গেলেন। সেই ত্রিতলের ঘরটিতে উষা শয়ন করে। কেবল একজন বিশ্বস্ত পুরাতন দাসী রাত্রে আসিয়া তাহার

নিকট শয়ন করে। যে দিন নীরদ গিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাহার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সেই চঞ্চল স্বভাব, হাসি, খেলা, রহস্য-প্রিয়তা সকলি ঘুচিয়াছে। সেই ষোড়শী বালিকা, এখন ম্লান গম্ভীর রমণীতে পরিণত হইয়াছে। যে দুটি চোক সদাই হাসি ও দুষ্টামিতে ভরা ছিল, এখন তাহা করুণার আলয় হইয়াছে। সেই শুষ্ক অধরে ম্লান হাসি প্রভাতের জ্যোৎস্নার মত দেখায়, মা দেখিয়া শিহরিয়া উঠেন। সেই সুন্দর সুগোল গঠন জ্বরের পর হইতে একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এখন একটি ক্ষীণকায়া বালিকার মত দেখাইতেছে।

নীরদ যাইবার কিছু দিন পরেই, তাহার অল্প অল্প জ্বর হইত। দিন কত সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার পর সেই জ্বর একজ্বরি হইয়া সে মাসাবধি শয্যাগত ছিল। তাহার পিতা মাতা কোনও ডাক্তার বা কবিরাজ দেখাইতে বাকি রাখেন নাই। তাহার পর জ্বর সারিলেও আর শরীর সারিল না। মায়ের প্রাণে সর্ব্বদাই অমঙ্গল আশঙ্কা জাগিয়া থাকিত। একে কয়েকটি সন্তান হারাইয়া তাঁহাদের এই সন্তান হইয়াছিল। সে তাঁহাদের চক্ষের মণিস্বরূপ ছিল। ঊষার মা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ঊষা শয্যায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া আছে। এক হস্তে এক খানি ছবি ধরিয়া আছে। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া শয্যার শিয়রে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন ঊষা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে, সেই রোদনে তাহার সমুদায় দেহ কম্পিত হইতেছে। তিনি সেই পালঙ্কে বসিয়া পড়িলেন। ঊষা চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, হস্তের ছবি শয্যাতলে পড়িয়া গেল। তাহার মা তাড়াতাড়ি সেটিকে উঠাইয়া দেখিলেন নীরদের ছবি, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেটিকে রাখিয়া দিলেন, এবং তাহার পর সস্নেহে ঊষার চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন—

"ঊষা কেন কাঁদচিস মা?"

তখনো ঊষার চক্ষের জল শুকায় নাই, সে অপ্রতিভ হইয়া হাসিল। সে হাসি, ক্ষীণ বিদ্যুতের মত ফুটিতে না ফুটিতে অধরে মিলাইয়া গেল। পুনরায় গৃহিণী কাতরকণ্ঠে কহিলেন—

"আমার কাছে এত লজ্জা কেন? কি হয়েছে আমায় খুলে বল্। তোর বাপেরত ভাবনায় আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছে, কি হয়েছে মা বল্"?

"মা! আমি তোমাদের অভাগিনী মেয়ে, আমার কথা আর ভাবিও না" এই বলিয়া পুনরায় ঊষা শয্যায় শুইয়া বালিশে মুখ লুকাইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

(শ্রীম-কথিত)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে]

চল ভাই ভগিনীগণ, আবার তাঁকে দর্শন করতে যাই। সেই মহাপুরুষকে, সেই বালককে দেখিব, যিনি মা বই আর কিছুই জানেন না। যিনি আমার জন্ত, তোমার জন্ত, সকলের জন্ত বলে দেবেন কি ক'রে এই কঠিন জীবন সমস্যা পূরণ করতে হবে—সন্ন্যাসীকে বলে দিবেন, গৃহীকে বলে দিবেন, পুরুষকে বলে দিবেন, স্ত্রীলোককে বলে দিবেন। অবারিত দ্বার। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আমাদের জন্ত অপেক্ষা করছেন। চল চল, তাঁকে দেখবো—

অশেষ গুণাকর প্রসন্ন-মূরতি,
যাঁর কথা স্মরি আঁখি ঝরে—

আজ রবিবার, ২৭এ অক্টোবর, ১৮৮৪ সাল। শীতকাল পড়িয়াছে, কার্ত্তিকের শুক্লা সপ্তমীতিথি।

দুপর বেলা। ঠাকুরের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত ঘরে ভক্তেরা সমবেত হইয়াছেন। সে ঘরের পশ্চিম দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বারাণ্ডা! বারাণ্ডার পশ্চিমে উদ্যানপথ উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। পথের পশ্চিমে মা কালীর পুষ্পোদ্যান, তাহার পরেই পোস্তা, তৎপরে পবিত্র-সলিলা দক্ষিণ-বাহিনী গঙ্গা।

ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত আছেন। আজ আনন্দের হাট। আনন্দময় ঠাকুর রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-প্রেম ভক্তমুখদর্পণে মুখরিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! আনন্দ কেবল ভক্তমুখদর্পণে কেন?—বাহিরের উদ্যানে, বৃক্ষপত্রে; নানাবিধ কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে;—বিশাল ভাগীরথী-বক্ষে; রবিকর-প্রদীপ্ত নীল নভোমণ্ডলে; গঙ্গা-বারি-কণবাহী শীতল সমীরণ মধ্যে;—এই আনন্দ প্রতিভাসিত হইতেছিল। কি আশ্চর্য্য! সত্য সত্যই 'মধুমৎ পার্থিবং রজঃ'—উদ্যানের ধূলি পর্য্যন্ত মধুময়—ইচ্ছা হয় গোপনে বা ভক্ত সঙ্গে এই ধূলির উপর গড়াগড়ি দিই। ইচ্ছা হয়, উদ্যানের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্ত দিন এই মনোহারী 'গাঙ্গ-বারি' দর্শন করি! ইচ্ছা হয়, এই উদ্যানের তরুলতা গুল্ম পত্রপুষ্প-শোভিত স্নিগ্ধোজ্জল বৃক্ষ-গুলিকে আত্মীয় জ্ঞানে সাদর সম্ভাষণ করি ও প্রেমালিঙ্গন দান করি। ইচ্ছা করে জ্যোতির্ম্ময় গগন পানে অনন্ত-দৃষ্টি হইয়া তাকাইয়া থাকি—কেন না, দেখিতেছি ভূলোক দ্যুলোক সমস্তই প্রেমানন্দে ভাসিতেছে! ঠাকুরবাড়ীর পূজারি, দৌ-বারিক, পরিচারক যেন সকলে পরমাত্মীয় বোধ হইতেছে; যেন এ স্থান বহু দিনান্তে দৃষ্ট জন্মভূমির ন্যায় মধুর লাগিতেছে;

আকাশ, গঙ্গা, দেবমন্দির, উদ্যান পথ, বৃক্ষ লতাগুল্ম, রক্ষক, সেবকগণ, আসনে উপবিষ্ট ভক্তগণ সকলে যেন এক জিনিসের তইরি বোধ হচ্চে। যে জিনিসে তইরি শ্রীরামকৃষ্ণ, এঁরাও বোধ হচ্চে সেই জিনিসের তইরি। যেন একটী মোমের বাগান— গাছ পালা, ফল পাতা, বাগানের পথ, বাগানের মালী, বাগানের নিবাসিগণ, বাগানের মধ্যস্থিত গৃহ সমস্তই মোমের। এখানকার সমস্ত যেন আনন্দ দিয়ে গড়া।

শ্রীমনোমোহন, শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ, মাষ্টার উপস্থিত ছিলেন। ক্রমে ঈশান, হৃদয় ও হাজরা। এঁরা ছাড়া অনেক ভক্তেরা ছিলেন। বলরাম, রাখাল এঁরা তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে। এই সময় নূতন ভক্তেরা আসেন যান—নারাণ, পল্টু, ছোট নরেন, তেজচন্দ্র, বিনোদ, হরিপদ। বাবুরাম আসিয়া মাঝে মাঝে থাকেন। রাম, সুরেশ, কেদার ও দেবেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রায় আসেন—কেহ সপ্তাহান্তর, কেহ দুই সপ্তাহের পর। লাটু থাকেন। যোগেনের বাড়ী নিকটে—তিনি প্রায় প্রত্যহ যাতায়াত করেন। নরেন্দ্র * মাঝে মাঝে আসেন—এলেই আনন্দের হাট। নরেন্দ্র তাঁহার সেই দেবদুর্লভ কণ্ঠে ভগবানের নাম গুণ গান করিতেন, অমনি ঠাকুরের নানাবিধ ভাব ও সমাধি হইত।—একটী যেন উৎসব পড়িয়া যাইত। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছা ছেলেদের মধ্যে কেহ তাঁর কাছে রাত্রি দিন থাকে—কেন না তারা সংসারে বিবাহাদি সূত্রে বা বিষয় কর্ম্মে আবদ্ধ হয় নাই। বাবুরামকে থাকিতে বলেন। তিনি মাঝে মাঝে থাকেন। শ্রীযুত অধর সেন প্রায় আসেন।

* ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ। তখন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত যুবক এবং ব্রহ্মসঙ্গীত গানে সুপটু ছিলেন।

ঘরের মধ্যে ভক্তেরা বসিয়াছেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়া—কি ভাব্‌ছেন। ভক্তেরা চেয়ে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মনোমোহনের প্রতি)। সব রাম দেখ্‌ছি। তোমরা সব বসে আছ—দেখছি রামই সব এক একটী হয়েছেন।

মনোমোহন। রামই সব হয়েছেন—তবে আপনি যেমন বলেন 'আপো নারায়ণঃ', জলই নারায়ণ, কিন্তু কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোয়া চলে, কোন জলে বাসন মাজা—

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, কিন্তু দেখছি তিনিই সব—জীব-জগৎ তিনিই হয়েছেন—

এই কথা বলিতে বলিতে তিনি ছোট খাটটীতে বসিলেন।

(সত্য কথা)

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি)। হাঁগা সত্য কথা কইতে হবে বলে কি আমার শুচিবাই হলো নাকি। যদি হঠাৎ বলে ফেলি খাব না, তো আর খিদে পেলেও খাবার যো নাই। যদি বলি অমুক লোক ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে যাবে—তাহারই নিয়ে যেতে হবে; আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বল্‌তে হবে। এ কি

হলো বাপু! এর কি কোন উপায় নাই?

(সঞ্চয় ও সন্ন্যাসী)

"আবার সঙ্গে করে কিছু আনবার যো নাই। পান, খাবার কোন জিনিস্ সঙ্গে করে আন্‌বার যো নাই। তাহলে সঞ্চয় হলো কি না। হাতে মাটী নিয়ে আসবার যো নাই!"

এই সময় একটী লোক আসিয়া বলিল, "মহাশয়, হৃদয় * যদু মল্লিকের বাগানে এসেছে—ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে—আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) হৃদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। তোমরা বোসো।

এই বলে কাল বার্ণিস করা চটী জুতাটী প'রে তিনি পূর্ব্বদিকের ফটক্ অভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল মাষ্টার্।

লাল সুরকীর উদ্যানপথ। সেই পথে ঠাকুর পূর্ব্বাস্য হইয়া যাইতেছেন। পথে খাতাঞ্চী দাঁড়াইয়াছিলেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। দক্ষিণে উঠানের ফটক রহিল—সেখানে শ্মশ্রুবিশিষ্ট দৌবারিকগণ বসিয়াছিল—বামে কুঠী। তৎপরে পথের দুই দিকে কুসুমবৃক্ষ, অদূরে পথের ঠিক্ দক্ষিণ দিকে গাজীতলা ও মা-কালীর পুষ্করিণীর সোপানাবলি-শোভিত ঘাট। ক্রমে পূর্ব্বদ্বারে বাম দিকে দারবানদের ঘর ও দক্ষিণে তুলসীমঞ্চ। উদ্যানের বাহিরে আসিয়া দেখেন, যদু মল্লিকের বাগানের ফটকের কাছে হৃদয় দণ্ডায়মান।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেবক সন্নিকটে।

হৃদয় কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান। দর্শন-মাত্র রাজপথের উপর দণ্ডের ন্যায় নিপতিত হইলেন। ঠাকুর উঠিতে বলিলেন, হৃদয় আবার হাত যোড় করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

কি আশ্চর্য্য! ঠাকুর রামকৃষ্ণও কাঁদিতেছেন। চক্ষের কোণে কয়েক ফোঁটা জল দেখা দিল। তিনি এই অশ্রুবারি হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন, যেন চক্ষে জল পড়ে নাই। যে হৃদয় তাঁকে কত যন্ত্রণা দিয়াছিল, তার জন্য ছুটে এসেছেন। আর কাঁদ্‌ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এখন যে এলি?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)—তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলাম। আমার দুঃখ আর কার কাছে বল্‌বো?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সান্ত্বনার্থ সহাস্যে)—

---

* হৃদয় মুখোপাধ্যায়—সম্পর্কে ঠাকুরের ভাগিনেয়, ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের নিকট সিওড়ে বাড়ী। পঞ্চবিংশতি বর্ষ ঠাকুরের কাছে থাকিয়া দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে মা কালীর পূজা ও ঠাকুরের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি বাগানের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের অসন্তোষভাজন হওয়াতে তাঁহার বাগানে ঢুকিবার হুকুম ছিল না। ঠাকুরের নিকট বড়লোক আসিলে ইনি তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করিয়া টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন। ঠাকুরের সমাধিকালে এই কার্য্য হইত। ঠাকুর আভাসেও ইহা জানিতে পারিলে মহা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া ঘরছাড়া করিতেন।

সংসারে এইরূপ দুঃখ আছে। সংসার কর্ত্তে গেলেই সুখদুঃখ আছে। (মাষ্টারকে দেখাইয়া), এঁরা এক এক বার তাই আসেন। এসে ঈশ্বরীয় কথা দু'টো শুনলে মনে শান্তি হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। তোর কিসের দুঃখ?

হৃদয় (কাঁদিতে কাঁদিতে)—আপনার সঙ্গ-ছাড়া, তাই দুঃখ!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুই তো বলেছিলি 'তোমার ভাব তোমাতে থাক্, আমার ভাব আমাতে থাক্'!

হৃদয়—হাঁ তা তো বলেছিলাম—আমি কি জানি?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ এখন এসো—আর এক দিন তখন ব'সে কথা হ'বে। আজ রবিবার, অনেক লোক এসেছে, তারা ব'সে রয়েছে। এবার দেশে ধান টান কেমন হ'য়েছে?

হৃদয়—হাঁ তা এক রকম মন্দ হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ তবে আয়—আবার একদিন আসিস্।

হৃদয় আবার সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিল।

ঠাকুর সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন। সঙ্গে মাষ্টার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি):—আমার সেবাও যত ক'রেছে, আমায় যন্ত্রণাও তেমনি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যারামে দুখানা হাড় হ'য়ে গেছিলাম—কিছু খেতে পেতেম না, তখন আমায় বল্লে "এই দেখ আমি কেমন খাই—তোমার মনের গুণে খেতে পাও না"। আবার বল্ তো "বোকা—আমি না থাকলে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে যেতো।"

একদিন এ রকম ক'রে এত যন্ত্রণা দিলে যে পোস্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ ক'রতে গিয়েছিলেম।

মাষ্টার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। বোধ হয় ভাবিতে লাগিলেন "কি আশ্চর্য্য! এমন লোকের জন্য ইনি অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন!"

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—

"আচ্ছা অত সেবা কর্ত্তো—তবে কেন ওর এমন হোলো? ছেলেকে যেমন মানুষ ক'রে, সেই রকম আমাকে দেখেছে। আমি তো রাতদিন বেহুঁস হ'য়ে থাক্‌তুম, তার উপর আবার অনেক দিন ধ'রে ব্যামোয় ভুগেছি। ও যে রকম ক'রে আমায় রাখ্‌তো, সেই রকমই আমি থাকতুম।"

মাষ্টার কি বলিবেন?—চুপ করিয়া রহিলেন। হয় ত ভাবিতেছিলেন যে হৃদয় নিষ্কাম হইয়া ঠাকুরের সেবা করেন নাই।

কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর নিজের ঘরে আসিয়া পঁহুছিলেন। ভক্তেরা প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ঠাকুর আবার ছোট খাটটীতে উপবিষ্ট হইলেন।

(ক্রমশঃ)

নারীর শিক্ষা।

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা বলেন যে, ঘরের কাজ কর্ম্মে সুদক্ষ হইতে পারিলেই নারীর উপযুক্ত শিক্ষা হইল; তাহার অধিক আর প্রয়োজন কি? নারী ত আর লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরী করিতে যাইবে না। তবে যাহাতে চিঠিপত্র লেখা ও হিসাবাদি রাখা চলিতে পারে, এতটুকু শিখিলেই যথেষ্ট হইল। নারীগণ সুকৌশলে ও সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইতে পারিলেই এই শ্রেণীর লোকের নিকট বুদ্ধিমতী বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাহার উপর যদি তাঁহাদের প্রকৃতি একটু মিষ্ট, শান্ত ও ধীর হইল, একটু ব্রত নিয়ম অনুষ্ঠানে মতিগতি হইল, তবে উক্ত শ্রেণীর লোকের নিকট, এই সকল মিলাইয়া, নারীজীবনের শিক্ষার চূড়ান্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা নারীগণকে জনসমাজে পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রশংসা লাভ করিতে দেখিলে, এবং পুরুষের উপর নির্ভর না করিয়া, স্বাবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে দেখিলেই, স্ত্রীশিক্ষার চূড়ান্ত ফল লাভ হইয়াছে মনে করিয়া যার পর নাই আনন্দ অনুভব করেন। নারীর গভীর পাণ্ডিত্য, কঠোর আত্মনির্ভর ও সামাজিক স্বাধীনতা তাঁহাদের নিকট যতটা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয়, তাঁহার গৃহধর্ম্ম, সন্তানপালন ও আত্মত্যাগ ব্রত যেন ততটা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। নারী-চরিত্রে দৃঢ় ভাবের বিকাশ তাঁহাদের যতটা আনন্দ বর্দ্ধন করে, কোমল ভাবের বিকাশ যেন ততটা করে না।

আমার মনে হয় এই দুই শ্রেণীর লোকই অল্পাধিক পরিমাণে ভ্রান্ত। যাঁহারা বলেন মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষায় আমাদের কি উপকার হইবে? নারী অশিক্ষিতা থাকিলে আমাদের সংসারের কাজকর্ম্ম ও আরাম সুখের কোনই হানি হয় না; তাঁহারা নারী-জীবনকে আপনাদের স্বার্থের দিক্ হইতেই দেখিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা কোন ক্রমেই ন্যায়-সঙ্গত নহে। যদিও নারী ও পুরুষের প্রকৃতি ও শক্তির বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে এবং তাঁহাদের স্বস্ব কার্য্যক্ষেত্রও স্বভাবকর্ত্তৃক অতি পরিষ্কাররূপেই বিভিন্নভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাপি মানবজীবনের মূল সামগ্রী যে আত্মা, তাহার অধিকারের কোনই ইতর বিশেষ নাই। পুরুষ জাতির স্বার্থসাধন অথবা সুখস্বচ্ছন্দতার জন্যই বিধাতা নারীকে জগতে পাঠাইয়াছেন, এ কথা কোন্ চিন্তাশীল, ন্যায়দর্শী ও সদাশয় ব্যক্তি মুখে আনিবেন? যাঁহারা এরূপ অনুদার কথা বলিতে চাহেন,

...হারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন প্রাচীন ভারতে আর্য্যসভ্যতার আলোক যখন সূর্য্যালোকের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল, তখন ভারতনারী ধর্ম্মগাথা রচনা করিতেন এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন? তাঁহারা কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে পবিত্র প্রাচীন আর্য্য-ভূমিতে গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী নারীগণ ব্রহ্মজ্ঞানে নিমগ্ন হইয়া তখনকার মহর্ষি-সমাজে ও জনসাধারণে সম্পূজিতা হইয়াছিলেন? সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শাক্যপত্নী যশোধারা কি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অল্প পরিচয় দিয়াছিলেন? জ্যোতিষ শাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্রের সহিত ভারত-নারী খনা ও লীলাবতীর নাম সংযোগ করিয়া কোন্ ভারত-সন্তান না আজিও গৌরব করিয়া থাকেন? নারীর অধিকার যে কত উচ্চ এবং উপযুক্ত সুযোগ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে তিনি যে কতদূর উন্নতি লাভ করিতে ও জগতের উন্নতির সহায়তা করিতে পারেন, তাহা চিন্তা করিতে উক্ত অনুদারমতাবলম্বিগণ পরাঙ্মুখ কেন?

সাধারণতঃ পুরুষজাতি আপনাদিগের জ্ঞান ধর্ম্ম ও সামাজিক সৎকার্য্য সাধনই বুঝেন এবং স্ত্রী-জাতিকে কয়েকটী মাত্র নিকৃষ্টাধিকারীর অনুষ্ঠানের অধিকার দিয়া, নারীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন শেষ হইল ভাবিয়া, মনে মনে বেশ সন্তুষ্ট থাকেন। তাঁহারা যত দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র আপনারাই অধ্যয়ন ও আলোচনা করিবেন, ধর্ম্মসাধনার জন্য অবসর করিয়া লইবেন, আর স্ত্রীজাতি—হতভাগ্য চোখঢাকা কলুর বলদের মত—অবিরাম অবিশ্রামে একঘেয়ে ভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদিগের জন্য সুখ শান্তি আরামের আয়োজন করিয়া দিবে, ইহাই কি ন্যায়সঙ্গত? যে জীবন্ত সত্য দেবতা সকল প্রকার ঐহিক পারত্রিক সুখের মূলাধার; যাঁহার সাক্ষাৎ কৃপা বিধানে সাংসারিক সুখ ভোগ করিয়া আমরা এই জগৎকে সুখময় স্থান বলি; যে দেবতা দেহের শক্তি, জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আলোক হইয়া আছেন, সেই দেবতার সাক্ষাৎ অনুভূতি, ধ্যান ধারণা, ভক্তি আরাধনা ও তাঁহার পবিত্র সেবা হইতে আজ ভারতনারী একপ্রকার বঞ্চিতা হইয়া রহিয়াছে এবং অনুদার সামাজিক প্রথার অনুমোদিত অতি সংকীর্ণ শিক্ষা ও কঠোর অধীনতার শাসনে দিবানিশি পশুর ন্যায় সংসারের কার্য্যে পরিশ্রম করিতেছে। তাহারা মন ও আত্মার প্রতি উদাসীন হইয়া, অসার ক্ষণস্থায়ী ধন মান সুখ সৌভাগ্য লাভের বৃথা আশায় আশ্বস্ত রহিয়াছে। ভারতনারীগণ বালিকা বয়স হইতে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, অনুপযুক্ত কালে জননী সাজিয়া সংসারের নানা কার্য্যে আবদ্ধ হয় এবং অস্ফুট শক্তি, ও অশিক্ষিত সংস্কার লইয়া, তীব্র শাসনে শাসিত হইয়া চিরজীবন অন্ধভাবে সন্তান পালন, গুরুজন সেবা ও সংসারাসক্তিতে লিপ্ত থাকিয়া, আত্মার উন্নতি সাধন বা প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি করিবার

সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। পুরুষের হিসাবপত্র ও প্রণয় পত্রিকা লেখা, অধীনতা শৃঙ্খলে নীরবে গুরুজন সেবা, চিরাগত প্রথায় গৃহকার্য্য ও অন্ধভাবে কতকগুলি শাবক পালন করিয়া জীবন শেষ করাই যেন নারী-জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য; ইহা হইতে উচ্চতর বিষয়ের অধিকার যেন ভগবান্ তাহাদিগকে দান করেন নাই! এ প্রকার অন্যায় কথা চিন্তা করিতেও হৃদয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। হায়, হায়! ভারতনারীগণের এখনও যে কি দুরবস্থা রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে প্রাণ বিদীর্ণ হয় ও হৃদয় হইতে আপনাআপনিই সহানুভূতি স্রোত ছুটিয়া বাহির হয়।

গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে পুরুষ জাতিরই প্রকৃত শিক্ষা নারীজাতির উপর নির্ভর করে। তাঁহাদের শৈশবকাল মাতৃক্রোড়ে অতিবাহিত হয় এবং শৈশবে তাঁহাদের স্বভাব জননীদ্বারা সংগঠিত হয়। তাঁহারা বাল্যকালে ভগিনীদের স্নেহ যত্নে বর্দ্ধিত হন, তাহাদের সঙ্গে খেলা করেন এবং নানাবিষয়ে তাহাদিগের নিকট সাহায্য ও শিক্ষা প্রাপ্ত হন। যৌবনকালে প্রণয়িনী তাঁহাদিগের সঙ্গিনী হন। স্ত্রী যদি উচ্চ-প্রকৃতিসম্পন্না ও সুশীলা হন, তবে স্বামীও তাঁহার সংসর্গ ও সাহায্যগুণে উন্নত হইতে থাকেন। আর স্ত্রী যদি নীচপ্রকৃতি, মুখরা ও দুঃশীলা হন, তবে স্বামী সুশীলপ্রকৃতি ও উন্নতমনা হইলেও সেই কুসঙ্গিনী পত্নীর অসদাচরণ ও নীচ ব্যবহারের মধ্যে সর্ব্বদা বাস করিয়া, অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে অধোগামী হইতে থাকেন। অনেক দুরাচার পশুতুল্য পুরুষও সাধ্বী স্ত্রীর প্রেমপূর্ণ অশ্রুসিক্ত অনুরোধে নিজ কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করত উন্নতি ও মহত্ব লাভ করিয়াছেন এবং কত বিপদাপন্ন ব্যক্তি বন্ধুবান্ধবের সহানুভূতি-হারা হইয়াও কেবল আপন পত্নীর প্রেমপূর্ণ সান্ত্বনা ও যত্ন মমতায় এবং আত্মবিসর্জ্জী সহিষ্ণু সেবা ও সৎপরামর্শ দ্বারাই দুঃখ ও বিপদ সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। ভাই ভগিনী সম্বন্ধেও ঠিক্ এই প্রকার। ভগিনী যদি সুশীলা হন, ধার্ম্মিকা হন, সুবোধ ও সুশিক্ষিতা হন, তবে দুরন্ত ও উগ্রপ্রকৃতি ভাইকে আপন স্নেহ যত্ন এবং চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা শান্ত ও বশীভূত করিয়া সৎপথে আনিতে পারেন।

সন্তানের সুশিক্ষা বিশেষভাবে জননীর উপর নির্ভর করে। ইহার সহজ কারণ এই যে জননীই শিশুর নিত্যসঙ্গিনী। শিশু সর্ব্বদা মাতারই অঞ্চল ধরিয়া থাকে এবং তাঁহার অঙ্কগত হইয়া, তাঁহারই স্নেহ যত্ন ও সেবায় প্রতিপালিত হয়। আর একটী প্রধান কারণ এই যে শিশুর তীক্ষ্ণ অনুকরণ-প্রবণ মন, ব্লটিং কাগজের ন্যায় অবিচারে মাতার দোষ গুণ সমস্তই শোষণ করিয়া লয়। মাতার যে কথা একটী-বার তাহার কর্ণে প্রবেশ করে অথবা তাঁহার যে কার্য্য বা ব্যবহার একবার তাহার চক্ষের সম্মুখীন হয়, তাহা আর কোন প্রকারে তাহার স্মৃতি হইতে মুছিয়া

যায় না। আমাদের পরলোকগতা কোন ভগিনী শিশুপ্রকৃতির এই গূঢ় তত্ত্বটী অতি সুন্দররূপে বুঝিতেন। এইজন্য তিনি রাগ প্রভৃতি মনের উত্তেজিত অবস্থায় তাঁহার দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে কখনও স্তন্য পান করাইতেন না—এমন কি সেরূপ অবস্থায় তাহাকে নিকটে বা সম্মুখে আসিতে দিতেন না। প্রত্যেক জননীর যদি এরূপ তীক্ষ্ণ কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আজ আর ভারতের এই দশা হইত না। বাস্তবিক জননীর যে কি মহা দায়িত্ব, তাহা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। যদ্দ্বারা ভারতের ভাবী বংশ নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্রে আপনা আপনি গড়িয়া উঠিতে থাকিবে, ভারতনারীকে সেই মাতৃত্বের শিক্ষা দান করিবার জন্য পুরুষগণকে ব্যস্ত হইতে দেখা যায় না। দেশাচারের অন্ধকারময় কু-সংস্কারাচ্ছন্ন অন্তমধ্যেই নারীজীবনের গুরুতর কর্ত্তব্যগুলি আবদ্ধ রহিয়াছে। অশিক্ষিতা ও কুশিক্ষিতা মাতা শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির অর্থই বুঝিতে পারেন না, কেবল স্বাভাবিক অপত্যস্নেহের অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানগণের লালনপালন করতঃ তাহাদের অন্তরে আপনাপন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার বা কুশিক্ষার বীজ বপন করেন মাত্র। যখন অধিকাংশ ভারত-মাতারই এই দশা, তখন কেবল চিঠিপত্র ও হিসাব লেখার উপযোগী বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাঁহাদের জীবন কখনও উন্নত হইবে না।

যদি শিক্ষা লাভের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে পারা যাইবে যে মানবের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য-সম্পাদনে তাহাকে সক্ষম করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং যে প্রণালীতে শিক্ষা দিলে নরনারী প্রত্যেকেরই সেই উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা প্রণালী। নারী-জীবনে এই কথা বিশেষভাবে খাটাইলে আরও একটী প্রশ্ন আপনাপনি মনে উদিত হয়। নারীর সাংসারিক কর্ত্তব্য কি? যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে নারীগণের পুরুষের সহিত সমান অধিকার কল্পনা করেন, আমার বোধ হয় প্রকৃতি মাতা নর নারীর কার্য্যক্ষেত্রের বিভিন্নতার দিকে যে ইঙ্গিত করিতেছেন, তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করিতে চাহেন না। সন্তানপালন ও গৃহসংরক্ষণ এই দুইটীই নারীর সাংসারিক জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহা হইলে যে প্রকার শারীরিক উপযোগিতা থাকা প্রয়োজন এবং স্নেহ, দয়া, ক্ষমা, প্রেম, আত্মত্যাগ, সেবা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি কোমল গুণ আবশ্যক, প্রকৃতি নারীকে প্রচুর পরিমাণে সেই সমস্ত উপযোগিতা ও গুণরাজিতে বিভূষিত করিয়াছেন। যাঁহারা নারী-জীবনের এই গূঢ় অভিপ্রায়—নারীজাতি দ্বারা মানব-সমাজের এই কোমল শান্তিময় বিকাশের ঐশ্বরিক বিধান উপেক্ষা করেন এবং

নারীকে সমাজগঠনের নিভৃত কোমল ক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিয়া দারুণ ঝঞ্ঝনাময় প্রতিযোগিতা-পূর্ণ, স্বার্থপরতা-প্রসূ কঠোর ক্ষেত্রে ফেলিতে চাহেন, তাঁহারা নিঃসন্দেহ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আজি যদি নারীগণ দলে দলে, তাঁহাদের সুশীতল ছায়াময় কার্য্যক্ষেত্রের দেবীমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক পুরুষের কার্য্যক্ষেত্রের পাষাণ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া ওকালতী, ব্যারিষ্টারি, রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন, এবং আপনাপন স্বামী সন্তান ও পরিজনবর্গের সুখসচ্ছন্দ এবং উন্নতি বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, জনসমাজের শিক্ষা সুখ ও উন্নতির জন্য চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে থাকেন, তবে গৃহসংসার অচিরেই অনাথ ও নিরানন্দময় হইয়া পড়িবে এবং তাহাতে জনসমাজ উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিশৃঙ্খল ও জীবনবিহীন হইয়া শ্মশানের আকার ধারণ করিবে। তবে কি নারীর কোনই সামাজিক স্বাধীনতা নাই? আছে বৈ কি? কিন্তু তাহার অর্থ অন্য প্রকার। নারীর সামাজিক স্বাধীনতার অর্থ ইহা নহে যে তাঁহাকে পুরুষের শ্রমক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পুরুষের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। ইহা স্বাধীনতার বিকৃত অবস্থা—স্বেচ্ছাচার নামে অভিহিত। নারী গৃহসংসারের কর্ত্তব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও, আপন অধিকারের অন্তর্গত সেবা, ধর্ম্ম ও উচ্চতর ভাব সকল জনসমাজে বিস্তার করিবার সম্পূর্ণ অধিকারিণী এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শন ও তীর্থপর্য্যটন প্রভৃতি হিতকর পুণ্য কার্য্যে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নারী আপনার কার্য্যক্ষেত্রের কোমল ধর্ম্মপ্রভাব জনসমাজে সঞ্চারিত করিলে সমাজ প্রকৃত পক্ষে উপকৃত এবং উন্নতই হইয়া থাকে। নারীর সে সামাজিক স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ। সেই সকল পুণ্য অভিপ্রায়ে নারী গৃহের বাহির হইলে তাঁহাদের অকল্যাণ ও ধর্ম্মের হানি হয়, এ কথা যাঁহারা বলেন তাঁহাদের কথা কোন কার্য্যেরই নহে। কিন্তু গৃহধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য ছাড়িয়া, রাজনৈতিক আন্দোলনে মিশিয়া বিবাদ বিসম্বাদ করাই যদি নারীর স্বাধীনতা নামে অভিহিত হয়, এবং জনসমাজে প্রচলনের চেষ্টা করা হয়, তবে তাহা প্রতিবাদ-যোগ্য।

শত বক্তৃতায়ও ভারত জাগিবে না, যদি ভারতনারী স্বকার্য্যসাধনোপযোগী সুশিক্ষা লাভ করিয়া গৃহমধ্যে নিজ নিজ জীবনের উচ্চতর প্রভাব সঞ্চার করিতে সমর্থ না হন, যদি নারী গৃহ-ধর্ম্মকে পশ্চাতে ফেলিয়া, পুরুষের সহিত বক্তৃতা করিয়া ভারত উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন, অথবা গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট না হইয়া দলে দলে অবলম্বনে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকেন, তবে ভারতের উদ্ধার না হইয়া বরং আরও অধঃপতন হইবে। কারণ তাহা হইলে, যে সুশৃঙ্খলাময় ও শান্তিপূর্ণ গৃহাশ্রম মর্ত্ত্যে স্বর্গের ছবি

এবং সন্তানের সুশিক্ষার একমাত্র উত্তম বিদ্যালয়, যে গৃহাশ্রম সংসারের তাপিত ও শ্রান্ত জীবনের, দীন দুঃখী অনাথের একমাত্র আরাম ও আশ্রয়স্থল, সেই গৃহাশ্রম ভারত হইতে শীঘ্রই বিদায় লইবে এবং এ দেশ উত্তপ্ত মরুভূমির আকার ধারণ করিবে। কিন্তু যদি ভারতনারী প্রকৃত মাতৃত্বের শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হইয়া গৃহাশ্রমকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল করিতে পারেন এবং সেখানে আপনাপন তনয়তনয়াগণকে সুশিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে পারেন, তবেই আবার ভারত কোন দিন মনুষ্যত্ব লাভে সমর্থ হইবে; কেননা ব্যক্তিগত জীবনের সমষ্টিতেই সামাজিক এবং জাতীয় জীবন।

নারী বাল্যকাল হইতে জ্ঞান ধর্ম্ম ও গৃহাশ্রমের কর্ত্তব্যপালনোযোগী সুশিক্ষা লাভ করিয়া, যথাসময়ে পরিণীতা হইবেন এবং সুগৃহিণী হইয়া শান্তি ও সুশৃঙ্খলায় গৃহসংরক্ষা করিবেন। তিনি আত্মীয়গণের সেবা ও অতিথি বান্ধবের পরিচর্য্যা করিবেন অথচ অক্ষুণ্ণ অপরাজিতচিত্তে সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানালোচনা ও ভক্তি ও প্রীতির সহিত ইষ্টদেবতার পূজার্চ্চনায় নিষ্ঠাবতী থাকিবেন। পতিপ্রাণা হইয়া কায়মনোবাক্যে স্বামীর সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের ভাগিনী হইয়া, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা ও তাঁহার ধর্ম্মসাধনে সহায়তা করিবেন এবং সন্তানগণের পালন ও তাহাদিগের সৎশিক্ষা ও মনুষ্যত্বের শিক্ষা বিধান করিবেন। পুরুষ নারী-রচিত সেই শান্তিময়, পবিত্রতাময় আনন্দধামের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করিয়া, কঠোর পরিশ্রম, কষ্ট দুঃখ দারিদ্র্য, বিপদ ক্লেশ ও রোগ শোকের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবেন এবং নারীর নিকটে ধৈর্য্য, প্রীতি, সেবা, আত্মত্যাগ ও ক্ষমা শিক্ষা করিয়া জনসমাজের কল্যাণ, সংস্কার ও উন্নতি-কামনায় দেহ মন প্রাণ নিয়োজিত করিবেন। নারীজাতির স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্র গৃহ। গৃহলক্ষ্মী যদি সুশিক্ষিতা ও গুণবতী হন, তবে তিনি স্বামীর স্বভাব, সন্তানের স্বভাব, গৃহের অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের ও দাস দাসী, প্রভৃতি প্রত্যেকেরই স্বভাব অমৃতময় করিয়া তুলিতে পারেন। তাঁহার কার্য্য অমৃত, তাঁহার কথা অমৃত, তাঁহার আদেশ অমৃত, ব্যবহার অমৃত, চরিত্র অমৃতময় হইতে পারে। তাঁহার এই অমৃতময় গুণাবলী দ্বারা গৃহমধ্যস্থ তাবৎ ব্যক্তির কার্য্য ও চরিত্র অনুরঞ্জিত হয় এবং সেই গৃহে সন্তোষ, দয়া, সৌজন্য, ক্ষমা, নিষ্ঠা, সেবা, কর্ত্তব্য ধর্ম্ম, পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ বিরাজ করিতে থাকে। সেই সুখের সংসারে যাঁহারা অতিথি হইয়া এক বেলাও কাটাইয়া যান, তাঁহারা স্বর্গের পবিত্র আনন্দ ও শান্তির কিছু আভাস সেখান হইতে লাভ করেন। কিন্তু শুষ্ক দেশাচারের বশীভূত হইয়া নারীজীবনের উদার শিক্ষার পথ বন্ধ করিয়া রাখিলে, অথবা নারীর পবিত্র

গৃহধর্ম্ম ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে স্বাবলম্বনে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জনের শিক্ষা দিলে, এই দৃশ্য কখনও ভারত সংসারে নামিয়া আসিবে না। নারীজাতি জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে সুশিক্ষিতা হইয়া প্রকৃত নারীত্বের শিক্ষায় সঞ্জীবিত হইলেই ভারতের গৃহাশ্রম আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে এবং দেশে নূতনশক্তি সঞ্চারিত হইবে।

শ্রীবিনোদিনী ঘোষ।

সঙ্গিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

চারুলতা ও সরলতা উভয়েই হিন্দু পুরাঙ্গনা। উভয়ে উভয়কে ভালবাসিতেন, উভয়ে উভয়কে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইতেন, পরস্পর পরস্পরের মিলনের জন্য আকুলনেত্রে পথ চাহিয়া থাকিতেন; কিন্তু সাংসারিক কার্য্য ও গুরুজনবর্গের অধীনতা বশতঃ সময় ও সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না, কেবল একবার মাত্র সন্ধ্যার পূর্ব্বে উভয়ের মিলনের অবসর ঘটিত।

আজও সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত উদ্যানে বসিয়া সঙ্গিনীদ্বয় কথোপকথন করিতেছিলেন। উদ্যানটী বড়ই মনোরম এবং সঙ্গিনীদ্বয়ের একান্ত প্রিয়। তদুপরি এ উদ্যানটি এমন ভাবে সংস্থাপিত যে চারুলতা ও সরলতার বাটীর নিকটে—উভয় বাটীই ইহার সংলগ্ন অথচ-নির্জ্জন। তাই এই সঙ্গিনীদ্বয় এখানে বসিয়া বড়ই আরাম পাইতেন—প্রাণ খুলিয়া কথা কহিয়া বিমল আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেন।

এক্ষণে আমরাও ইহাঁদের কথোপকথনের কিয়দংশ উপভোগ করিব।

চারু। কাল ভাই তোমাকে একটা কথা বলব ব'লে বলতে ভুলে গিয়াছিলাম, রাত্রে সেই কথাটা মনের মধ্যে কেবল তোলাপাড়া হ'তে লাগল।

সর। এমন কি কথা?

চারু। তুমি কাল বল্লে প্রতাপ প্রেমিক নহে, কিন্তু তোমারই মুখে এক সময় শুনিয়াছি "প্রতাপ প্রেমিকের উজ্জ্বল আদর্শ"। এটা কিরূপ কথা?

সর। হাঁ একদিন আমি ওকথা বলিতাম বটে। যখন প্রেমতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করি নাই, তখন ওকথা বলিতাম। কিন্তু তন্ময়চিত্তে প্রেমের স্বরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে আর প্রতাপকে প্রেমিক বলিতে ইচ্ছা হয় না। সুতরাং আমার মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছি। মহাত্মা বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "যাহার কখনও মত পরিবর্ত্তন হয় না, হয় সে মূর্খ ভ্রান্ত,

নয় তিনি অভ্রান্ত দৈবশক্তিবিশিষ্ট" কথাটা প্রতি বর্ণে সত্য। একসময়ে একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছি—সেই কথাটা বজায় রাখিবার জন্য সত্যের অপলাপ করা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। যাহা সত্য তাহা স্বীকার করা, তাহা প্রচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য—সত্যই প্রধান ধর্ম্ম।

অনন্তর চারুলতা একটি প্রস্ফুটিত বসোরা গোলাপ তুলিয়া সরলতার মাথার খোঁপায় গুঁজিয়া দিলেন। সরলতা ঈষৎ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "ছি ভাই, কি করলি? অমন সুন্দর ফুলটি আমার মাথায় না দিয়া দেবতার চরণে অর্পণ করিলে কত সুখের হইত বল্ দেখি! আজ তুমি যেমন এই সুন্দর ফুলটির অসদ্ব্যবহার করলে, আমরাও তদ্রূপ আমাদের পবিত্র জীবনকে অসদ্ব্যবহারে কলুষিত করিতেছি। সাধক রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—

'এমন মানব জমী রইল পতিত আবাদ করলে ফল্ তো সোণা।'

বস্তুতঃ মানবজীবন গভীর উদ্দেশ্যপূর্ণ, কেবল আহার নিদ্রায় ইহা অতিবাহিত করিবার দ্রব্য নহে। কিন্তু আমরা কি করিতেছি? সোণা ফলান দূরের কথা, ইহাতে পিতলও ফলিতেছে না, কেবল ভস্মরাশি উদ্গত হইতেছে মাত্র। আমাদের সম্মুখে কত কার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে, আমরা কি করিলাম?"

চারু। আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের আর কি করিবার আছে? পর-মুখাপেক্ষিতাই আমাদের ভরসা।

সর। ঐ আমাদের ভ্রম, স্ত্রীলোক বলিয়া তাহাদের জীবন কি কর্ত্তব্যশূন্য? কর্ত্তব্যই জীবনের ভিত্তি—ভগবান সে ভিত্তি-শূন্য করিয়া কখনই স্ত্রীলোকের সৃষ্টি করেন নাই, তবে বেসেরামতিতে তাহাতে অনেক আগাছা উৎপন্ন হইয়া তাহার শিথিলতা ঘটিয়াছে এইমাত্র, কিন্তু সে ত দোষ আমাদের! মেয়েমানুষ হলেই বা—তাহাদেরও ত মনুষ্যত্ব আছে! সাবিত্রী মেয়ে মানুষ হইয়া কি না করিয়াছিলেন? সীতা স্ত্রীলোক, তাঁহার নাম কেন প্রাতঃস্মরণীয়? আর পরমুখাপেক্ষিতার কথা কি বলছ, সেটাত আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা বড়ই দুর্ব্বল জাতি, অপরের উপর নির্ভর না করিয়া একপদও দাঁড়াইবার ক্ষমতা আমাদের নাই। এ অবস্থায় যে মুহূর্ত্তে আমরা অন্যের উপর নির্ভর ত্যাগ করিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা বাতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় পতিত হইব—আমাদের জীবনের মূল গ্রন্থি ছিন্ন হইবে। আমাদের শাস্ত্রকারগণ যে সকল ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা সমাজের প্রভূত মঙ্গলকর—তাঁহাদের বাক্য অভ্রান্ত—তাঁহারা যোগবলে ঐশী শক্তি লাভ করিয়া দর্শন ও বিজ্ঞান রাজ্য এমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে আধুনিক মহামহোপাধ্যায় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে মস্তক ঘুরিয়া যায়। তাঁহারা সেই অন্তর্দৃষ্টি শক্তিতে দেখিয়াছেন সমাজে

কোন্‌টা মঙ্গলকর ও কোন্‌টা অমঙ্গলকর। সেই পূজ্যতম আর্য্যবাক্য,—

তিষ্ঠেৎ পিতৃবশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সম্প্রাপ্তযৌবনে।
বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ কচিৎ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

আমি যেটাকে অধীনতা বলিতেছি, ইহা অধীনতা নহে—ইহা নির্ভরের ভাব, ইহাতে মনুষ্যত্ব। নির্ভরতা-শূন্য জীবন উচ্ছৃঙ্খল। অতএব ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি এই পর-মুখাপেক্ষিতাই আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের কারণ। আমরা না হয় স্বামী বা গুরুজনবর্গের মুখাপেক্ষী, আর আমাদের স্বামী বা গুরুজনবর্গ সমাজের মুখাপেক্ষী—তবে আর স্বাধীন রহিল কে? সবাইত অধীন! কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহা অধীনতা নহে। দুষ্ট অশ্ব যেমন চালককে নিয়ত বিপথগামী করিবার চেষ্টা করে, মানবের মনও তদ্রূপ প্রতিনিয়ত বিপথে ধাবিত হইয়া থাকে; সমাজই সুদৃঢ় বল্‌গারূপে আমাদিগকে বিপথ হইতে সৎপথে আকর্ষণ করিয়া আনিতেছে। পরস্পর সকলেই যদি স্বাধীন হইত, কেহ যদি কাহাকেও ভয় না করিত—গ্রাহ্য না করিত, তবে এ সংসার উচ্ছৃঙ্খলতার লীলাভূমি হইত—সুখ শান্তির পবিত্র জ্যোতি এখান হইতে বিলুপ্ত হইত। সে অবস্থা ভাবিতেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

চারু। তুমি যাহা বলিলে, তাহা অলৌকিক নহে। ভাবিয়া দেখিলে ইহার সারবত্তা শুধু আমি কেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এখানে একটা কথা আছে।

সর। কি?

চারু। অধীন ব্যক্তিগণকে অনেকেই এমন পদ-পেষিত করিয়া রাখিতে চাহেন, যে অধীন ব্যক্তিগণের আর মাথা তুলিবার উপায় থাকে না। সেটা কি ভাল?

সর। অনেক স্থলে এরূপ ঘটে সত্য; তাহা যে ভাল এ কথা বলি না, কিন্তু সে দোষ প্রথার নহে—ব্যক্তিত্বের। ব্যক্তিগত উন্নতি হইলেই অযথা অত্যাচার উপশমিত হইবে।

চারু। কি উপায়ে ব্যক্তিগত উন্নতি হইতে পারে?

সর। কর্ত্তব্যানুশীলনই ইহার মূল ভিত্তি। ধর্ম্মপ্রাণতাই ইহার সুদৃঢ় বন্ধন। ধর্ম্মপ্রাণতা না থাকিলে মানুষ মানুষ হইতে পারে না।

চারু। মানুষের কর্ত্তব্য কি ধর্ম্মপ্রাণতা হইতে পৃথক্?

সর। পরস্পরের অতি নৈকট্য সম্বন্ধ; দুয়েই এক, একেই দুই। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি না থাকিলে ধর্ম্মপ্রাণতা থাকে না; আবার ধর্ম্মপ্রাণতা ব্যতীত যে কর্ত্তব্য, তাহার ভিত্তি বড়ই শিথিল, তাহা টিকিতে পারে না। একাধারে উভয়েরই অনুশীলন প্রয়োজন।

চারু। কোন্ কোন্ বৃত্তির অনুশীলনে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়?

সর। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে এসম্বন্ধে বিশদরূপে বলিয়া গিয়াছেন,

সুতরাং আমার আর অধিক কিছু বলিবার নাই। তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি দয়া স্নেহ প্রেম প্রভৃতির সমধিক অনুশীলনেই মানুষ দেবত্ব লাভ করে। দয়া বলিলে কেবল যে মানুষের প্রতি দয়া বুঝিতে হইবে, তাহা নহে। দয়া বৃত্তি যখন সম্যক্‌রূপে অনুশীলিত হয়, তখন তাহা জগতের প্রত্যেক অণুতে সম্বেষ্টিত হয়। শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বন্য বানরগুলিকে পর্য্যন্ত যত্ন করিয়া আহার করাইতেন। বলিতেন "আমাদের যত্ন করিবার অনেক লোক আছে, ইহাদের কেহ নাই"—ইহা দয়াবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনেরই অমৃতময় ফল।

সর্ব্বজীবে সমদর্শিতা ব্যক্তিগত উন্নতির আর একটি মহান্ উপায়। ইহাতে দোষ দর্শন ঘুচিয়া যায়, অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়। শ্রীবৃন্দাবন-স্থিত মহাত্মা গৌর শিরোমণি প্রভুর (এখন তিনি চিন্ময় রাজ্যে) সমদর্শিতা বৃত্তি এরূপ সুন্দর অনুশীলিত হইয়াছিল যে তিনি ইতর জীব কুকুরটিকে পর্য্যন্ত মহৎ জ্ঞান করিয়া তাহাদের নিকট যোড়হস্ত হইতেন।

চারু। তোমার মতে দেখ্‌ছি মানসিক বৃত্তিগুলির সম্যক্ অনুশীলনই মনুষ্যত্ব লাভের উপায়।

সর। নিশ্চয়ই—আর শুধু আমার কেন? বিবেচক মাত্রেই এ কথার সত্যতা অস্বীকার করিবেন না।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া উভয়ে ক্ষুণ্ণ চিত্তে পরস্পরের নিকট হইতে পরস্পরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে চারুলতা বলিলেন "কাল একটু সকালে আস্‌তে চেষ্টা করো। তোমাকে বল্‌বার আমার অনেক কথা আছে"।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী (মুস্তোফী)।

চুট্‌কী গল্প।

১

সে কালের কোন কোন স্থানের গ্রাম্য চৌকীদারেরা "পাঁচহাতিয়ার" ধারণ করিত। ঢাল তলোয়ার, ধনুঃশর, সড়্‌কি, টাঙ্গী ও ব্যাঘ্রনখ, এই পাঁচটিকে "পাঁচ হাতিয়ার" কহে। টাঙ্গী, কুঠার বা পরশু বিশেষ। ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রনখযুক্ত অঙ্গুরীবৎ শস্ত্র, হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলি অষ্টকের পৃষ্ঠদেশে ধৃত হইয়া থাকে। ঐ শস্ত্র দ্বারা শত্রুকে ব্যাঘ্রনখাঘাতের আস্বাদন করাইতে পারা যায়। কোন গ্রামের চৌকীদার রাত্রি-কালে উপরি-উক্ত পঞ্চবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নিজ মহল পাহারা দিত। এক দিন তাহার মহলে ডাকাইতি হইল। দস্যুদল কোন সম্পন্ন গৃহস্থের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন, ২।১ খানি তৃণাচ্ছাদিত গৃহ দগ্ধ, ও ২।৪ জন মনুষ্যকে হতাহত করিয়া প্রস্থান করে। পরদিন পূর্ব্বোক্ত

নিকটবর্ত্তী পুলিসের দারোগাবাবু—এখনকার সব্ ইন্স্পেক্টর (Sub-Inspector of Police), বক্সি বাবু (Writer constable), কয়েকজন লাঠিয়াল ও ঢাল-তলোয়ার-ধারী পেয়াদা সঙ্গে করিয়া উক্ত গৃহস্থভবনে দর্শন দিলেন। পাড়ার "পাঁচহাতিয়ার"-ধারী চৌকিদারও অদ্ভুত বেশে হাজির হইল। দারোগাবাবু উক্ত চৌকীদারকে লইয়া তদন্তের গৌর-চন্দ্রিকা ভাঁজিতে সুরু করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে চৌকিদার, ডাকাইতেরা কল্য রাত্রে যখন এই বাড়ী লুঠ তরাজ করে, তখন তুমি মওড়া দিয়াছিলে ? চৌকিদার উত্তর করিল,—

"হুজুর, এখানে মোটে আসিতে পারি নাই, তার মওড়া দিব কি ?"

"কেন, তুমি কি ডাকাতদিগের সোর সরাবৎ শুনিতে পাও নাই ?"

"ধর্ম্ম অবতার, শুনিতে খুব পেয়েছিলাম। যখন তাহারা রৈ রৈ শব্দে এই বাড়ী আসিয়া পড়িল, তখন আমি ভাবিনী বৈষ্ণবীর দাওয়ায় বসিয়া তামুক খাইতেছেলাম, আর তাহার সঙ্গে গল্প করিতেছেলাম। তখন পরামাণিক বুড়ো তার ঘরের মধ্যে খক্ খক্ করে কাশিতেছিল, বেটা যেন "কাগ-পোড়া" খেয়েছে। তখন রাত্রি ১টা। ধর্ম্ম অবতার মা বাপ, এর একটা কথাও মিছে নয়" বলিয়া চৌকীদার নীরব হইল। দারোগা—"বেটা বদমায়েস্, আমি কি তোর নিজের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, না ডাকাত পড়ার কালে মওড়া দিয়াছিলি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি ? কৈ হ্যায়রে, লাগাও পঁচাশ জুতি।" "আজ্ঞে, সেই কথাটা ? তা যখন তখন বলিলেই হবে। এখন, আপনিত এখানে অনেকক্ষণ ধরিয়া থাকিবেন,—সে জন্যে এত চটিতেছেন কেন ?" এই কথা বলিতে না বলিতে পাঁচহাতীয়ারধারী চৌকীদার বাহাদুরের পৃষ্ঠপত্রে ১০।১৫ বা জুতার পরিবেশন হইয়া গেল! তখন কি করেন, পুরুষ-সিংহের অপূর্ব্ব চরিতাংশ, যাহা গত রজনীতে ঘটিয়াছিল, অগত্যা তাহার বিবরণ কহিলেন,—

"ডাকাত পড়ার সোরসরাবৎ শুনিবামাত্র, এই দিকে ছুটিলাম। বৈষ্ণবীর বাড়ী হতে এদিকে আসিতে হইলে ২।৩ খানা রহরের ক্ষেত পার হইয়া আসিতে হয়। শুধু এদিকে কেন ? আমার মহলের যে দিক্ হইতে যে দিকে যাই না কেন, কোন দিকে আকের ক্ষেত, কোন দিকে শণের ক্ষেত, কোন দিকে পাট বা মেস্তার ক্ষেত পার না হইয়া কোন দিকে যাওয়া যায় না। ঐ সকল ক্ষেতে ঢুকিলেই ঘোর বিপদ্।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই অধোবদনে মস্তক কণ্ডূয়ন আরম্ভ করিল। দারোগা বাবু কহিলেন,—"কিরে ব্যাটা, চুপ্ করিলি যে, বাজেকথায় এক ঘণ্টা কাটাইলি, আসল কথা বল্ না ?"

"আজ্ঞে, বলি। রহর বনে যেই ঢুকেছি, সেই বিপদ্। এক দিকে লড়কির গোছা বাধিল, অন্য দিকে বন্দুক বাধিয়া গেল।

অনেক কষ্টে ছাড়াইয়া ছুটিতে লাগিলাম। একটা আইল পার হতে না হতে, আবার শড়্কি বাধিল। কোন গতিকে শড়্কি ছাড়াইলাম, অন্তদিকে তীর ধনুক বাধিয়া গেল। এখন জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি,—গাছ বড় ও ডাল পালা শক্ত হয়েছে। একবার বাধিলে আর রক্ষা নাই। ধর্ম্ম অবতার বলিব কি? রহর গাছের সঙ্গে লড়াই করিতে করিতে রাং ফুরিয়ে গেল। আমিও বেজায় কেলান্ত হয়ে পড়িলাম। একটা অশোথ গাছের তলায় যে পড়া, সেই ঘুম্। খানিক আগে কে একটা বেতোরুগী বাবু আমাকে একটা লাথি মেরে চলে গেল। বাবুটার পা, যেন কালবন্দি ঘোড়ার খুর, কেমন লেগেছে, দ্যাখেন দিখি। বুঝি বা অক্ত পড়ে। আমারে যেন ষাঁড় দেগে ছেড়ে দিয়েছে; আপনারা এ দিকে ত নজর দেবেন না, আমাদের শরীর ত নোয়ার নয়?"

"তুই পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া সত্য,—সত্য ছাড়া মিথ্যা কহিব না, এই ভাব মনে রেখে বল্ দেখি! তুই চেষ্টার মত চেষ্টা করিলে, গত রাত্রের দুর্ঘটনা কালে এখানে আসিতে পারিতিস্ কিনা?"

"দারোগা মশাই বড় হয়েছেন কি না, তাই বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। চেষ্টার মত চেষ্টা কি? কাঁধে টাঙ্গী ছিল, ঘচাঘচ্ রহর গাছ কেটে,—রাজপথ তয়ের কোরে আসিতাম।"

"তবে এলিনা কেন?"

"আপনি নিতান্তই ক্ষেপেছেন, এ যে নিষেধ কর্ম্ম। যখন এই চাকরি নিলাম, তখন আমার মা বাপ তাঁদের পায়ে আমার দুই হাত রাখিয়া দিব্বি করিয়ে নিলেন যে, আমি কখনও চোর ডাকাতের সমুখে যাব না। আপনার কথার ধরণে বোধ হইতেছে, আমি ডাকাতের সমুখে আসি, আর তারা আমাকে কেটে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলুক; কেমন বলুন্ দেখি, আপানার ঠিক্ এই ইচ্ছা কি না?"

দারোগা বাবু কহিলেন,—"রামসিং," "হুজুর" বলিয়া রামসিং দারোগা বাবুকে সেলাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কহিল,—"বান্দা হাজির, কি হুকুম হয়?"

"এই বদ্মায়েস বিশ্বাসঘাতক বেটারে ঐ শিমূল গাছের সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধ,—এমন করিয়া বাঁধিবে যেন গায় হাত বুলাইতে না পারে,—পরে পাছায় উপরি উপরি পঞ্চাশ বেত লাগাও। এই সিকিটা লও, দড়াদড়ি কিনিয়া আন।" চৌকিদার কহিল, "ধর্ম্ম অবতার, বেশ কথা! ভোজপুরেগুলো যসায়সি আসুক, আমি ততক্ষণ হাতিয়ারগুলো একে একে খুলিয়া আপনার সমুখে রাখি। নহিলে এই আপদ গুলা গায়ে থাকিলে নাকি বেত খাওয়াটাও ডাকাত ধরার মত হইয়া পড়িবে।" দারোগাবাবু বোধ হয় চৌকিদার প্রার্থনা না করিলেও অস্ত্র ত্যাগের আদেশ করিতেন। চৌকিদার তাড়াতাড়ি পাঁচ-হাতিয়ার ত্যাগ করিল এবং বেঁতের ভয়ে লম্ফে লম্ফে পা ফেলিয়া এক ছুটে পলায়ন

করিল। "ধর্—ধর্"—কয়েক জন অনুচর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, আর ধরে কে!

পাথুরেঘাটার অঞ্চলে কোন কারণে ঠিক্ এই প্রকৃতির কোন একটী ম্যানেজার ছিলেন। সম্প্রতি তিনিও প্রায় এইরূপ কারণে পলায়ন করিয়াছেন। তাঁহার পরিণামের প্রতি আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিবে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৮ ই ডিসেম্বর বড় লাট লর্ড কুর্জন দাক্ষিণাত্য পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। দরবার ও উপাধি বিতরণের মহা ঘটা হইতেছে।

২। গোয়ালিয়র, বিকানীর ও বলরামপুর প্রভৃতির মহারাজগণ কলিকাতায় আসিয়াছেন।

৩। বৎসর আবার শেষ হইল, বোয়ার যুদ্ধ শেষ হইল না। বোয়ারেরা ইংরেজাধিকার কেপ কলোনী আক্রমণ করিয়া পুনরায় ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

৪। সমবেত শক্তি-পুঞ্জ চিনের সহিত সন্ধি প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবার জন্য চিন গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

৫। পার্লেমেণ্ট আফ্রিকার যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য আবার কোটি কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়া আপাতত স্থগিত হইয়াছে।

৬। গত ২৭এ ডিসেম্বর হইতে ৪ দিবস লাহোরে ষোড়শ কন্‌গ্রেসের অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিক সুখের বিষয় কন্‌গ্রেসের সভাপতি নারায়ণ গণেশ চন্দ্রবাকর বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি জন্য মনোনীত হইয়াছেন।

৭। ভারতদুর্ভিক্ষে জাপান ২৪,২৫০ টাকা দিয়াছেন। এক জন বাঙ্গালী ও একজন শিখ ছাত্রের উদ্যোগে এই টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৮। সম্প্রতি ফ্রান্সে মহিলারা ওকালতী করিবার অধিকার পাইয়াছেন।

৯। গত ৩রা ডিসেম্বর বরদার মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

১০। লর্ড আম্পহিল মান্দ্রাজের নূতন গবর্ণর হইয়াছেন।

১১। ম্যাঞ্চেষ্টারের ডিউকপত্নী হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের নিতান্ত অনুরাগিণী। তিনি বিলাতে ইহার চর্চা করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া ভারতে আসিতেছেন।

১২। ডাক্তার উইলসন বলেন কলিকাতার পুরুষসংখ্যা ৪॥০ লক্ষ, কিন্তু স্ত্রীলোকসংখ্যা ২॥০ লক্ষ মাত্র।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ধর্ম্মসাধন—শ্রীললিতমোহন দাস এম্, এ, প্রণীত—মূল্য ৸৹ আনা। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম। লেখক ইহাতে যেমন ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধীয় মত ও প্রণালী সকলের বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাব দ্বারা সেগুলিকে সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন। তাঁহার মত সমর্থনার্থ যে সকল শ্লোক ও দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলিও ধর্ম্মার্থীদিগের সাধনার সহায় হইবে। লেখা সরল, যুক্তি-তর্ক সুন্দর এবং ভাব উদার প্রায় সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। সাধন-প্রবর্ত্তক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধকদিগের পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

২। বিশাখা—বাবু চারুচন্দ্র বসু প্রণীত, ইহা বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত একটী নারীর চরিত্র। ধনীর কন্যা হইয়াও কিরূপ সৌজন্য-পরায়ণা, শ্রমশীলা কার্য্যদক্ষা, সর্ব্বগুণসম্পন্না, নিষ্ঠাবতী ও ধর্ম্মের জন্য ত্যাগশীলা হইতে হয়, যাঁহারা দেখিতে চান, বিশাখা তাঁহাদের নিকট আদর্শনারী। ইহা পাঠ করিয়া নারীগণ আমোদিত ও উপকৃত হইতে পারিবেন।

নারীধর্ম্ম শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (সরস্বতী) প্রণীত ও শবাসনা আগামী বারে সমালোচ্য।

বামারচনা।

মানব-জীবন।

কেন আসে কেন যায়?
কোথা এর শেষ হায়!
কোথা আছে বিশ্রাম ইহার?
কেন দুদিনের তরে
দুর্ব্বহ জীবন ভারে
দীর্ঘশ্বাসে কাঁদে অনিবার?
কিসের উদ্দেশ হেতু
বাঁধে এ জীবন সেতু,
ভেঙ্গে যদি হবে চুরমার?
কোন্ সে মায়ার ঘোরে,
মৃত্যুরে ভাবে গো দূরে,
শুনিয়াও সন্নিকট পদধ্বনি তার!
নাহি সুখ নাহি শান্তি,
তবুও কিসের ভ্রান্তি
রাখে তারে ভুলাইয়া হেথা?
শেষ হইলেও বেলা
ছাড়িতে জীবন-ভেলা
চাহে না—কেন এ ঘোর তৃষা?
ক্ষণিক জীবন ব্রত
সাঙ্গ করি পান্থমত

চলে যায় কোন্ মহাদেশে ?
সেথা কি জীবন নদী
এমনি বিষাদে কাঁদি
বহে যায় সদা দীর্ঘশ্বাসে ?

শ্রীলজ্জাবতী বসু।

শোক।*

শোক, তুই সংসারের নিদারুণ শেল
মানব হৃদয়ে,
তোর তরে কত নর,
ভগ্নমনা নিরন্তর,
শ্রীহীন করিস্ তুই নবীন যৌবনে,
অকালে শুকায় নর তোর পরশনে। ১

বৈরীর প্রধান তুই শোক দুরাচার,
মানব জীবনে।
কে আছে রে তোর মত,
অকালে কাঁদাতে অত,
রে নির্দ্দয় তুই বিনা কেবা হেন আর,
আমোদ প্রমোদ মাঝে আনে হাহাকার ?২

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম প্রমোদ-কানন—
বিলাস ভবন,
ওই শোক তোর তরে,
অশ্রু পড়ে ঘরে ঘরে,
সতত ঢালিস তুই হরিষে বিষাদ,
বুয়রের সমর তোর পুরাইছে সাধ। ৩

দুর্ব্বলা অবলা মোরা বড় ভয় করি,—
নিশি দিন তোরে,
স্বামি-পুত্র দূরদেশে,
সদা থাকি চিন্তা ক্লেশে,
না জানিরে শোক কবে তোর কোপে পড়ি!
"রবার্ট্‌সে" কাঁদালি তুই পুত্রধন হরি'। ৪

বীরশ্রেষ্ঠ কিংবা বড় যত মহাজন,
সংসার ভিতরে,
সকলেই তোর তরে,
কেঁদেছেন আঁখিভরে,
ধৃতরাষ্ট্র, দশরথ, বশিষ্ঠ, রাবণ।
আজিও ভারতেশ্বরী করেন রোদন। ৫

কত আশা করি মোরা স্বজনের তরে—
কত দুঃখ সহি সুখে,
আশা করি "এম্.এ" দিয়ে আসিবে সত্বরে,
সুখাশায় ভাসি পুনঃ অসুখ সাগরে। ৬

সে দিন গিয়েছে মম আত্মীয় দুভাই,
পড়িতে কলেজে,
আসিল না তারা আর,
আসিয়াছে হাহাকার,
হৃদয় জ্বলিয়া যায়, শান্তি কোথা পাই ?
রে শোক বারিতে তোরে কেহ বুঝি নাই॥

শ্মশান।

(ইংরাজী 'গ্রেভ' কবিতার ছায়াবলম্বনে)

দুঃখীর বিরাম স্থান তুমি হে শ্মশান,
শোকী তাপী সবাকার জুড়াবার স্থান।

* লেখিকার দুই দেবর কলেজে পড়িতে গিয়া ওলাউঠা রোগে এককালে মারা গিয়াছেন। শান্তি-দাতা ঈশ্বর শোকার্ত্ত পরিবারদিগকে সান্ত্বনা দান করুন! বা, বো, স।

ছোট বড় ভেদাভেদ না করি বিচার,
আলিঙ্গন কর সবে বলি আপনার। ১
অসহ্য আতপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণার জ্বালায়,
পথিক আশ্রয় স্থান খুঁজিয়া বেড়ায়;
করিয়া বিশ্রাম করে ক্লান্তি বিমোচন,
সুস্থ হয় তৃষ্ণা ক্ষুধা করি নিবারণ। ২
সংসার অনল-তপ্ত মনুষ্য তেমন
বিশ্রাম লভয়ে এসে তোমার সদন।
সংসারের দুঃখ জ্বালা পাপ প্রলোভনে,
ব্যাকুল করিতে পুনঃ নারে সেই জনে। ৩
শান্তি দাও তুমি সবে ওহে শান্তিময়!
তোমার আলয়ে গেলে তাপ নাহি রয়।
সহিতে পারি না আমি মনের-বেদন,
তাই যেতে চাই এবে তোমার ভবন। ৪
সুখের অনন্ত ঘুমে হইলে নিদ্রিত,
অলীক সুখের স্বপ্ন হবে তিরোহিত।
স্থান দিয়ে দুঃখ জ্বালা নিবার শ্মশান,
বিশ্রাম আলয়ে গিয়ে জুড়াই পরাণ। ৫
তুমি কি পথিক নও? বলহে মানব!
বিদেশে পথের ক্লেশ সহ নাই সব?
সংসার সমুদ্র-ঝড়ে নাবিকের প্রায়,
তব প্রাণ ডুবু ডুবু হয়নি বন্যায়? ৬
যদিও সয়েছ তুমি অনেক যাতনা,
বাকী নাই তব কিছু সংসার-তাড়না।
অধীর হ'ওনা, শান্ত কর তব মন,
পাইবে সন্দর—নাম "শান্তি নিকেতন!" ৭
ঘটুক যতেক দুঃখ যেথা তুমি রও,
অজ্ঞান পাতকী বলে নত শিরে রও,
ধীর ভাবে সুখী হও বিধির বিধানে,
শিরে ধর তাঁর আজ্ঞা আনন্দিত প্রাণে। ৮
বিপদ যন্ত্রণা দেখে গণ না প্রমাদ,
দুঃখের মূলেতে হের সে মঙ্গল-হাত।
সন্তানের অমঙ্গল মা কি কভু করে?
তাঁর প্রেম বিন্দু এক মায়ের অন্তরে। ৯
দুঃখ-ভারাক্রান্তে তিনি সদা দয়াবান,
সবে সম সুখ দুঃখ করেন বিধান।
বিপদ ভেষজ দিয়া পীড়িত সন্তানে,
টানেন আরাম করি স্বরগের পানে। ১০
ওই দেখ শান্তিধাম নহেত সুদূরে,
(ওই) বিশ্রাম ভবন আছে পথিকের তরে।
শোকী তাপী সবাকার শান্তির আলয়,
দূরে যায় ক্লেশ, পেলে ওখানে আশ্রয়। ১১
আপনার প্রতিকৃতি করিয়া মানবে,
পাঠান অখিল-পিতা নশ্বর এ ভবে।
সন্তান আবার যবে স্বরগে যাইবে,
অনন্ত উন্নতি শান্তি সেথানে পাইবে। ১২

শ্রীবিনোদিনী সেন।

মহাপ্রভু।

বাহিরে তোমারে আমি চাহি না ঈশ্বর!
অন্তরের মধ্যে তুমি থাক নিরন্তর।
পবিত্র দেবতা তুমি অন্তরের ধন,
নিত্য নিত্য পূজি তোমা নিত্য নিরঞ্জন।
নির্বিকার নিরাকার অতি নিরমল,
দাও প্রভু একবার চরণ-কমল।
অনাদি অনন্ত তুমি অমূল্য রতন,
প্রাণের বিমল শান্তি—চিত-বিনোদন।

শ্রীঅম্বুজা।

পুরীধাম।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৮ বর্ষ। ৪৩৩-৩৪ সংখ্যা। | মাঘ, ফাল্গুন, ১৩০৭; ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ১৯০১ | ৭ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গে শিক্ষা—গত বর্ষের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ—বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে বিদ্যালয়-সংখ্যা ৬৪,৬৫৩ এবং ছাত্রসংখ্যা ১৬,৮৭, ৫৯৫; পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা বিদ্যালয়-সংখ্যা ৪৪৭টী কমিলেও ছাত্রসংখ্যা ১৮,৮১০ বাড়িয়াছে। কলেজ ৩৯ স্থানে ৪৪ হইয়াছে। ১৮,৯৮ সালে ৩৩৫৬ বালিকা বিদ্যালয় ও ৬৫,৯৭৪ ছাত্রী ছিল, ১৯০০ সালে বালিকা বিদ্যালয় কমিয়া ২৭১৯ এবং ছাত্রীসংখ্যা ৫৮, ৩৩১ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট স্ত্রী-শিক্ষার ব্যয় কমাইয়াছেন বলিয়া এই হীনাবস্থা, দেশ-হিতৈষিগণ কি ইহার প্রতীকার করিতে পারেন না?

আফিস পরিবর্ত্তন—জামালপুরের অডিট আফিস হাবড়ায় উঠিয়া আসাতে প্রায় ২০০০ বাঙ্গালী কেরাণী সপরিবারে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

নারী বিদ্বেষিণী সভা—[illegible]কার সকলি অদ্ভুত! হার্টফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি ছাত্র নারীজাতির কল্যাণ ও উন্নতির বিরুদ্ধে এক সভা করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের উচ্চশিক্ষার এবং বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার পরিচায়ক বটে! যাহা হউক বাধাই উন্নতির প্রাণ, ইহা দ্বারা স্ত্রীজাতির উন্নতির সহায়তাই হইবে।

ষোড়শ জাতীয় মহাসমিতি—দুর্ভিক্ষ, এদেশীয় লোকের সমর ও শিল্পশিক্ষা, বিচার ও শাসন বিভাগের বিয়োজন, মাদক ও গোরার অত্যাচার নিবারণ, বন্দোবস্তী মহলের বিস্তার, ব্যবস্থাপক সভার দেশীয় সভ্যের সংখ্যাবৃদ্ধি ইত্যাদি শুভকর প্রস্তাব লাহোর কংগ্রেসে আলোচিত হইয়াছে। আগামী সপ্তদশ কংগ্রেস কলিকাতায় হইবে।

নূতন কলেজ—মজঃফরপুর কলেজে বি এ এবং টাঙ্গাইল প্রমথ মন্মথ কলেজে

এফ এ পর্য্যন্ত শিক্ষাদান বড় লাটের অনুমোদিত হইয়াছে।

ছাত্রীনিবাস—ঢাকা ইডেন স্কুলের সহিত ছাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা হইতেছে। প্রত্যেক ছাত্রীকে বেতন সহিত মাসে ৭॥• টাকা দিতে হইবে।

ডাকের উন্নতি—ভারতবর্ষে গত বৎসর ডাকঘর মোটে ১২৩৫৭ ও লেটর বক্স ২৪০০৬ ছিল। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে।

লর্ড রবার্টস ইংলণ্ডে—গত ৫ই জানুয়ারি হইতে লর্ড রবার্টস ইংলণ্ডীয় সেনাদিগের প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইংরেজ সাধারণে বিশেষতঃ রাজপরিবার তাঁহার সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনি নব শতাব্দীর "ওয়েলিংটন বীর" বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

হিন্দু ছাত্রাবাস—প্রয়াগে একটী হিন্দু ছাত্রাবাস স্থাপনার্থ নিম্নলিখিত দাতব্য স্বীকৃত হইয়াছেঃ—

কাশীর মহারাজ	১০,০০০
কাণ্ডিতরাজ	১০,০০০
সার মহারাজ প্রতাপনারায়ণ	৫০০০
অন্যান্য দান	৪০,০০০

প্রতিবিঘায় ১৫ মণ ধান্য—বর্দ্ধমান কৃষিক্ষেত্রে গোবর, রেড়ির খইল ও হাড়ের গুঁড়া প্রভৃতি সারদানে ধান্যের ফলন ও তৎসঙ্গে লাভও অধিক হইয়াছে। ভাল তদ্বির হইলে ভারতের মাটীতে সোণা ফলে।

মোহন মেলা—গত ১৪ই হইতে ১৬ই পৌষ পর্য্যন্ত সিঁথির বাগানে মোহন মেলা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলে ইহা দেশীয় শিল্প কৃষিজাতের জাতীয় মহামেলায় পরিণত হইতে পারে।

আসিয়াটিক সোসাইটী—ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিপোষক হইয়া ইহার উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার সাহায্যার্থ বার্ষিক ৩০ সহস্র টাকা প্রদত্ত হইবে।

মহারাণীর বক্তৃতা—আফ্রিকা ও চিনে সামরিক ব্যয়ের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ পার্লেমেণ্ট বসিয়াছিল, তাহাতে সাম্রাজ্ঞী সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন "এক্ষণে বর্দ্ধিত ব্যয় মঞ্জুর করিবার জন্য আপনাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। বসন্ত কালের পার্লেমেণ্টে রাজকীয় অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইবে।" বর্দ্ধিত ব্যয় মঞ্জুর হইয়া গিয়াছে।

মাঘোৎসব—রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া যান, তাহার বয়ক্রম ৭১ বৎসর পূর্ণ হইল। সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ আবার উৎসাহের সহিত আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছেন। ভারতের প্রাচীন ঋষি মুনি-বন্দিত এক অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে এ উৎসব স্বর্গীয় দৃশ্য। ব্রাহ্মগণ যথার্থ ধর্ম্মজীবনে পূর্ণ হইয়া মৃতকল্প ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করুন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই প্রার্থনা করি।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

(গতবারের শেষ)

সেই রাত্রে অনেক কথা বার্ত্তার পর কর্ত্তা ও গৃহিণী স্থির করিলেন তীর্থযাত্রা করিবেন। বাড়ীতে কেহ নাই, কাজেই সঙ্গে উষা ও কিরণচন্দ্র যাইবেন। কিরণ উষার অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট, দ্বাদশবর্ষীয় বালক মাত্র। সে এই তীর্থ-যাত্রায় দেশ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষায় আনন্দে অধীর হইল। ইস্কুলের তাড়া থাকিবে না, একি কম সুখের কথা? যাইবার বন্দোবস্ত করিতে, ঘর কন্না গুছাইতে, কাজ কর্ম্মের শৃঙ্খলা করিতে প্রায় মাসাবধি গত হইল। তাহার পর তাঁহারা একদিন শুভক্ষণে তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে উমাকান্ত বাবু নীরদকে লিখিলেন "আমি তীর্থযাত্রায় বাহির হইলাম"। অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহারা বাহির হইলেন। বৈদ্যনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহারা কোন তীর্থই বাকি রাখিলেন না। যে তীর্থে যে দেবমন্দিরে উষা গিয়াছে, সেই খানে একান্ত ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্বামীর দর্শন কামনা করিয়াছে। সেই শুষ্ক ম্লান মুখ ও সজল নয়নে তাহার লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা কাশী প্রয়াগ ইত্যাদি সারিয়া, কানপুর, দিল্লী দেখিয়া মথুরা বৃন্দাবনে গেলেন। উষার মার জয়পুর দেখিবার বাসনাও পূর্ণ হইল। হরিদ্বার ও গঙ্গার উৎপত্তি স্থান দেখিয়া তাঁহারা পুনরায় আগ্রায় আসিলেন। উমাকান্ত বাবু স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া আগ্রা হইতে নীরদকে টেলিগ্রাম করিলেন "আমি কল্য লাহোরে পঁহুছিব। এত নিকটে আসিয়া তোমাকে না দেখিয়া ফিরিতে পারিলাম না।"

সে সময় বড়দিন, সে দিন ২৬ শে ডিসেম্বর। তাহার পর দিন লাহোরে কনগ্রেসের অধিবেশন হইবে। নীরদ চন্দ্র কনগ্রেসওয়ালা, তিনি সে দিন অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। কনগ্রেস কমিটির মেম্বরগণ তাঁহার হস্তে কয়েকটি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবসর ছিল না। দ্বিপ্রহরের সময় যখন আহার করিতে গৃহে আসিলেন, আসিবা মাত্র ভৃত্য সেই টেলিগ্রাম খানি আনিয়া দিল। এক বৎসর হইতে চলিল উষাকে না দেখিয়া স্বদেশে ছুটিয়া যাইতে প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু "উষা যখন আমায় ভালবাসে না, আমায় দেখিলে তাহার যন্ত্রণা বাড়িবে, তাহার সুখের জন্য আমি আত্মসুখ ত্যাগ করিব" এই ভাবিয়া তিনি নিজেকে নিঃস্বার্থ প্রণয়ের আদর্শ মনে করিয়া নীরবে সেই তুষানল হৃদয়ে ধারণ করিয়া দিন কাটাইয়াছেন। কতবার ভাবিয়াছিলেন এই বড় দিনের ছুটীতে

"লাজ মান ভাসায়ে দিয়ে" একবার কলিকাতায় যাইবেন, কিন্তু এই কনগ্রেসের হাঙ্গামায় তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে কোনমতে ছাড়েন নাই, সেজন্য আর সে বিষয় ভাবিবার অবসর ছিল না। আজ সহসা এই টেলিগ্রাম খানি হস্তে ধরিয়া নীরদচন্দ্রের হৃদয়ে তুফান উঠিয়াছে। শ্বশুর মহাশয়ের আগমন সংবাদে তাঁহার চিন্তাসূত্র শতধা হইয়া পড়িল। তিনি বুঝিলেন না যে উষাও আসিতেছে, কারণ পত্রে বা টেলিগ্রামে সে বিষয় ত লেখা ছিল না। আর এও কি সম্ভব যে তাঁহাদের একমাত্র আদরের কন্যাকে সাধিয়া জামাই বাড়ীতে দিয়া যাইবেন? তিনি মনে স্থির জানিলেন "তাহা কথনই হইতে পারে না।" তাঁহার সেদিন আর ভালরূপে আহারাদি হইল না। ভৃত্যাদিগকে গৃহদ্বার উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিতে বলিয়া,শ্বশুর মহাশয়ের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, তিনি তিনটার সময়ে ষ্টেসনে গিয়া ট্রেণের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

ক্রমে ট্রেণের গতি হ্রাস হইতে লাগিল। উষা গবাক্ষ পথে চাহিয়া দেখিল ইহা এক বৃহৎ ষ্টেসন। পরে ফিরিয়া দেখিল পিতা সকল দ্রব্যাদি এক স্থানে গুছাইয়া রাখিলেন, জননী মস্তকে কাপড় টানিয়া দিয়া বসিলেন। ট্রেণ গুরু গম্ভীর ধ্বনিতে, ধীরগতিতে প্লাটফরমে প্রবেশ করিল। সে চুপি চুপি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল "আমরা কি এখানে নামিব? এ কোন্ ষ্টেসন মা?"

মৃদু হাসিয়া সেই প্রকার মৃদু কণ্ঠে মা কহিলেন "লাহোর।"

উষাও চক্ষের পল্লব পড়িয়া গেল, মা দেখিলেন সহসা মেয়ের কপোলে রক্তিম আভা ফুটিয়া উঠিল। উষার হৃদয়ে এক সুখের স্রোত বহিয়া গেল। সে বুঝিল না ইহা স্বপ্ন, কি সত্য! তাহা বুঝিবারও অবসর ছিল না। গাড়ী আসিবা মাত্র তাহার পিতা উৎসুক নেত্রে চাহিয়া গবাক্ষে মুখ বাড়াইয়া দিলেন, পর মুহূর্ত্তেই বলিলেন

"এই যে নীরদ, কেমন সব মঙ্গলত?"

উষা তৃষিত চক্ষু তুলিয়া একবার সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত মুখ খানি দেখিবার জন্য চাহিল।

মুহূর্ত্তের জন্য সেই প্রকার অন্য দুটি তৃষিত নয়নের দৃষ্টি তাহার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। এইবার উষা মরিতে পারিবে কি?

মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ীতে দ্রব্যাদি গুছাইয়া, নীরদ তাঁহাদিগকে লইয়া গৃহে আসিলেন। উমাকান্ত বাবু জামাইয়ের বিনয়, সৌজন্যে, কথায় ও যত্নে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহাদের থাকিবার, শয়ন করিবার, আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, নীরদ উমাকান্ত বাবুকে বলিলেন "কিছু মনে করিবেন না, আজ এখানকার সকল লিডার বার লাইব্রেরিতে রাত্রিভোজনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন, সেজন্য আমাকেও যাইতে হইবে। বোধ হয় আসিতে রাত হইবে। আপনারা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করুন।

আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন না। এই দীর্ঘ পথ ট্রেণে আসিয়াছেন।"

"তুমি কখন আসিবে?"

"কাল কনগ্রেসের অধিবেশন, কি করিয়া স্থির বলিব কখন আসিব?"

তিনি যাইবার সময় ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন, আফিস ঘরে যেন তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখে।

তাঁহার ফিরিয়া আসিতে বারটা বাজিয়া গেল। তিনি আসিয়া আফিস ঘরেই শয়ন করিলেন। সে দিন কে কোথায় শুইয়াছে, তাহাও জানিতেন না, কাজেই তাঁহার সহিত সে রাত্রে আর উষার সাক্ষাৎ হইল না। তাঁহার বাড়ী খানি একটি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা, তিন চারিটি মাত্র ঘর।

পর দিন অতি প্রত্যূষে তিনি উমাকান্ত বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কালি কোনও কষ্ট হয় নাইত?"

"না, না, কষ্ট কেন হবে? নীরদ! এখানে তোমার বাসায় এসে আমার যে আনন্দ হয়েছে, তা ব'লে জানাবার নয়।"

"আজ কনগ্রেসের অধিবেশন, আমায় এখনি যাইতে হইবে। আহারাদির বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতে সেই স্থানে স্থির আছে। কাজেই আমার আসিতে সন্ধ্যা হইবে। আপনারা এ নিজের বাটী মনে করিয়া, কোন বিষয়ে সঙ্কুচিত হইবেন না। বড় দুঃখের বিষয় আমি নিজে এ সময় কিছু দেখিতে পারিতেছি না।"

"সেজন্য তোমার ভাবিতে হইবে না, আমরা বেশ আছি। আজ একবার সহর দেখিতে গেলে হয় না?"

"ওঃ তা ত ঠিক্, আমি এতক্ষণ বলিব বলিব করিয়া সে কথা ভুলিয়া গেছি। সহরে না গিয়া 'সাহদ্রায়' জাহাঙ্গীরের সমাধি ও রণজিৎ সিংহের সমাধি দেখিয়া আসিবেন। আপনি ত আগ্রায় তাজমহল দেখিয়াছেন। আপনার হয় ত তত ভাল লাগিবে না।"

"এখানে এসেছি যখন তখন সব দেখিব বই কি।" নীরদচন্দ্র যাইবার সময় ভৃত্যকে বলিয়া গেলেন "বাবুর আহারাদির পর একখান ভাল গাড়ী আনিয়া সাহাদ্রায় বেড়াইয়া আনিও।"

উমাকান্ত বাবু দ্বিপ্রহরে গাড়ী আসিবার পর সপরিবারে ভ্রমণে বাহির হইলেন। উষার যাইতে আদোবে ইচ্ছা ছিল না, স্বামীর গৃহে আসিয়াও স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় যন্ত্রণায় তাহার হৃদয় পুড়িতেছিল। তবু সে চলিল, একলা থাকিতে সাহসে কুলাইল না। তাঁহারা যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছে। উমাকান্ত বাবু বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন বাহিরের গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। স্ত্রী কন্যাকে ভিতরে রাখিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন নীরদ শয্যায় শুইয়া আছেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া কয়েকজন লোক বসিয়া আছেন। তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে নিকটবর্ত্তী একটি ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন

"মহাশয়! কি হইয়াছে? নীরদ অমন করিয়া কেন পড়িয়া আছেন?"

"আপনার সহিত নীরদ বাবুর কি বিশেষ আলাপ? আমরা তাঁহার শ্বশুর উমাকান্ত বাবুকে টেলিগ্রাম করিব ভাবিতেছি।"

"কেন কি হইয়াছে? যাহা বলিবার আমাকেই বলুন, আমিই উমাকান্ত দত্ত"।

"কিছু মনে করিবেন না মশায়, আমরা জানিতাম না যে আপনিই উমাকান্ত বাবু। কনগ্রেস হইতে ফিরিবার সময় নীরদের টমটমের সহিত একটি বুড়ির ধাক্কা লাগায় নীরদ গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়াছেন। পায়ে দু এক যায়গায় খুব আঘাত লাগিয়াছে; বোধ হয় ব্রেণেও লাগিয়াছে।"

"আমায় কি করিতে হইবে বলিয়া দিন, ডাক্তার বাবুকে ডাকান হয় নাই?"

"এই যে স্বয়ং ডাক্তারের সহিত কথা কহিতেছেন" দ্বিতীয় ব্যক্তি এই বলিয়া প্রথম ব্যক্তিকে দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তার তখন তাঁহাকে আবশ্যক সকল ঔষধ পত্রের কথা বলিয়া দিলেন, এবং যাহাতে বেশী কথাবার্ত্তা না কহেন সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলিলেন। গাড়ী হইতে পড়িয়া নীরদ মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলেন, অল্প ক্ষণ হইল চেতনা হইয়াছে! তিনি তবুও অচেতনের মত শয্যায় পড়িয়া ছিলেন। ডাক্তার এও বলিয়া দিলেন রাত্রে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইলে যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়, এবং একজন লোক যেন সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাছে বসিয়া থাকে।

উষা ও তাহার মা ভিতরে আসিয়াই ভৃত্যদিগের নিকট সকল কথা শুনিয়াছিলেন। তবে তাঁহারা পঞ্জাবী ভাষায় অনভিজ্ঞ থাকায় সকল কথা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া সত্য কথা জানিতে কিরণকে বাহিরে পাঠাইলেন। উষা উঠিয়া কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল। উষার মাতা বাহিরে যাইবার দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিরণ অল্প ক্ষণ পরেই ভিতরে আসিল। কিরণের জুতার শব্দ পাইয়াই উষা নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল। কিরণ ও তাহার মা জানিতেন উষা ঘরের ভিতর আছে কারণ স্বচক্ষে তাঁহারা যাইতে দেখিয়াছিলেন। উষার মা কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন

"কিরণ কি হয়েছে?"

"জামাই বাবু গাড়ী থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন, ব্রেণে খুব লেগেছে।"

"কাকেও জিজ্ঞাসা করেছিল? কোনও ভয় নাইত?"

"কি জানি দুজন বাবু চুপি চুপি কি সব বলাবলি কচ্ছিলেন।

"তুই শুনতে পেলি?"

"হাঁ, বল্লে আজকের রাত না কাটলে ভরসা নাই।"

কিরণের মাতার হৃদয়ের রক্ত স্রোত যেন থামিয়া গেল, তিনি ঈশ্বরের নাম লইলেন। এমন সময় সম্মুখে কি পড়িয়া

...ণচন্দ্র শব্দ পাইয়া ছুটিয়া গিয়া ...কার করিয়া কহিল

...গীর এসো দিদিমণি পড়ে

"ওমা সে কি গো" বলিয়া মা ছুটিয়া আসিয়া কন্যাকে ধরিলেন। উষা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। মা বলিলেন

"কেন উষা কি হয়েছে মা? পায়ে হোঁচোট লেগেছে বুঝি?"

"হাঁ, চৌকাটে মাথা লেগে কেমন মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম"।

মা সাশ্রুনয়নে মেয়ের প্রতি চাহিয়া, বুঝিলেন কেন মাথা ঘুরিয়াছে। স্ত্রীলোকের মনের কথা স্ত্রীলোক মাত্রেই জানে।

গভীর নিশীথে উষা শয্যা ত্যাগ করিয়া, একাকিনী কক্ষের বাহিরে আসিল। ডিসেম্বরে লাহোরের শীত, যে একবার গিয়াছে, তাহার হাড়ে মজ্জায় জাগিয়া আছে। সেই শীতে কম্পিতদেহে, কম্পিত-হৃদয়ে, ও কম্পিত চরণে উষা বাহিরের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। উষার পিতা কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। নীরদের তখন সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান হইয়াছিল, তিনি শ্বশুরকে শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া, একজন ভৃত্যকে বসাইয়া রাখিলেন, এবং আবশ্যক হইলেই ডাকিতে পাঠাইবেন প্রতিশ্রুত হইলেন। উষার পিতা ভাবিয়াছিলেন বাটীর ভিতরে সকলে ঘুমাইতেছেন। তিনি ভৃত্যকে বলিয়া নীরদের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে শয্যা প্রস্তুত করাইয়া শয়ন করিলেন; উষা বা তাহার মাতা কিছুই জানিল না। উষা যখন স্থির জানিল তাহার মা ঘুমাই-তেছেন, তখন আর হৃদয়ের অসহনীয় যাতনা সহিতে না পারিয়া কক্ষের বাহিরে আসিয়া, নিঃশব্দ-পদ সঞ্চারে, নিতান্ত অপরাধীর মত বাহিরে আসিল। বাহিরের বারান্দায় দীপ জ্বলিতেছিল, ও দুই জন ভৃত্য কাটের গুঁড়ি জ্বালাইয়া বসিয়া-ছিল। তাহারা উষাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। উষা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছিল, লজ্জা ত্যাগ করিয়া কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল

"বাবু কোন্ ঘরে আছেন"?

একজন ভৃত্য পথ দেখাইয়া চলিল। উষা গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল

"ঘরে দেখিয়া এসো কে আছে।"

ভৃত্য ধীরে ধীরে কপাট খুলিয়া, হস্তের ইঙ্গিতে গৃহস্থিত ভৃত্যকে ডাকিল। সে বাহিরে আসিলে বুঝাইয়া দিল "মাজী গৃহের ভিতর বাবুজীকে দেখিতে যাইবেন"। সে আসিয়া সসম্ভ্রমে পঞ্জাবী ভাষায় বলিল "আপনি ভিতরে যান, বাবুজী এখন বেহোস হইয়া পড়িয়া আছেন। আমরা এই দুয়ারের কাছে বসিয়া আছি, ডাকিলেই আমরা আসিব।"

মাজী সে সব কথা বিশেষ করিয়া না বুঝিলেও অর্থ করিয়া লইল। তাহার পিতার নিকট সর্ব্বদাই হিন্দুস্থানী দরওয়ান থাকিত, সেজন্য সে অল্প স্বল্প কহিতে ও বুঝিতে পারিত।

উষা কম্পিতচরণে কক্ষে প্রবেশ

করিল। তখন আর তাহার লজ্জা মান অভিমান ছিল না। স্বামীর জীবনের আশঙ্কায় তাহার অন্তর আকুল হইতেছিল। সে যখন গৃহে প্রবেশ করিল; তখন নীরদ ঘুমাইতেছিলেন। উষা দেখিল টুলের উপর একটি কেরোসিন ল্যাম্প ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী একটি টেবিলে ঔষধের শিশি ইত্যাদি রহিয়াছে। সে ধীরে ধীরে পালঙ্কের নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিল, স্বামী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া আছেন, সে ভাবিল নিশ্চয়ই অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন। প্রদীপের ছায়া ও আলোকে তাঁহার মুখ কিরূপ বিবর্ণ দেখাইতেছিল। সে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, স্বামীর চরণপ্রান্তে মাথা থুইয়া অস্ফুটস্বরে আকুল হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিল

"হে দয়াময় জগদীশ্বর! দয়া করিয়া বাঁচাও। আমার পাপের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। হে হরি! একবার জ্ঞান হোক্, আমি একবার দেখি, একবার কথা কই, সকল কথা ব'লে ক্ষমা চাই। তুমি অন্তর্যামী জগদীশ, তুমি কি জান না যে আমার কি কষ্টে বৎসর কাটিতেছে। যদি একজনের প্রাণ লইলে সন্তুষ্ট হও, হে ঠাকুর! আমার প্রাণ নেও, আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইয়া আমায় রক্ষা কর।" এই বলিয়া সে অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল, পরে উঠিয়া ধীরে ধীরে নীরদের পার্শ্বে গিয়া ভূমিতে জানু পাতিয়া সেই অশ্রুসিক্ত মুখ লইয়া স্বামীর মুখের উপর থুইল। অধরে অধর স্পর্শ করিল, চক্ষের জলে নীর[illegible] ভাসিয়া গেল আত্মহারা হই[illegible] মুখ উঠাইল না।

সহসা নীরদের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়[illegible] তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার মুখের উপর কে মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। তাঁহার হৃদয়ের রক্ত-স্রোত দ্রুত বেগে বহিতে লাগিল। চমকিত হইয়া তিনি দুই হস্তে সে মুখ উঠাইয়া দেখিলেন, এ কি এই শিশির-সিক্ত নিশার কমলের মত এ কাহার মুখ অশ্রু জলে ভাসিতেছে? একি উষা? অথবা স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্নে কি এমনি স্পর্শানুভব হয়? তিনি কাতর কণ্ঠে কহিলেন

"উষা? না আমার মাথার ব্রেণ কি সত্যই খারাপ হইয়া গেছে। এসব কি দেখিতেছি? এ কি স্বপ্ন?"

উষার চক্ষের জলধারা পুনরায় বেগে ঝরিল, সে আনন্দে বিবশা হইয়া স্বামীর গলা জড়াইয়া, সোহাগের কণ্ঠে বলিল "স্বপ্ন নয় প্রাণাধিক! এ যে তোমারই উষা।"

"আমার উষা?" নীরদের হৃৎপিণ্ড কি বাহির হইয়া পড়িবে? আনন্দে অথবা সেই দারুণ শীতে কি হৃদয় এত কম্পিত হইতেছে?

"তোমার নয় কার? ক্ষমা কর, আমি যদিও তোমার চরণে শত অপরাধে অপরাধী, আজ এই লজ্জা মান অভিমান, বিসর্জ্জন দিয়া তোমার চরণে ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছি। আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া উষা স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইল।

নীরদ উঠিয়া বসিলেন, ডাক্তারের মানা আর মনে রহিল না। চির-আকাঙ্ক্ষিত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য সম্মুখে দেখিলে, নিজস্ব বলিয়া জানিলে লোকে কি তাহা ফেলিয়া দেয়? কাঙ্গালের কি স্বর্গের স্বপন ফলিলে পায়ে ঠেলে? নীরদ উঠিয়া বসিয়া ঊষার মুখ পুনরায় দুই হাতে তুলিয়া ধরিলেন—বলিলেন

"ঊষা, তুমি কি সেই ঊষাই আছ? তুমি না বলিয়াছিলে আমায় কখনো ভালবাস নাই, তবে কেন আমায় আদর করিতেছ? এও সব কি মিথ্যা?"

ঊষা চক্ষের জলে অন্ধ হইয়া স্বামীর চরণে লুটাইয়া পড়িল—

"সে দোষে আর আমাকে ত্যাগ করিও না। আমি অজ্ঞান ছিলাম, তোমার আদরে তোমার ভালবাসায় অন্ধ হইয়াছিলাম, এখন আমি জানিয়াছি তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। তোমা ভিন্ন আমার জগতে সুখ নাই।"

"ঊষা! আমি বুঝিতে পারিতেছি না, এও কি সত্য?

তবে তুমি কি আমায় ভালবাসিতে, এখনো কি ভালবাস? একবার বল, যদি মরিয়া যাই, তবু মরিবার পূর্ব্বে সুখ শান্তিতে মরিতে পারিব।"

মরিবার নামে ঊষার যেন চক্ষের দীপ্তি নিভিয়া গেল, তাহার হৃদয়ে কে যেন বিশ মণ পাথর চাপাইয়া দিল। সে আকুল হইয়া স্বামীকে আঁকড়িয়া ধরিল, তাহার পর স্নিগ্ধদৃষ্টিতে স্বামীর চক্ষের প্রতি চাহিয়া কহিল:—

"তোমায় ভালবাসি না, তবে কাকে ভালবাসিব প্রিয়তম? সেই দিন অন্ধ অভিমানে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলাম, তাই তুমি ফেলিয়া চলিয়া আসিলে, এই এক বৎসর ধরিয়া তাহার কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই? আমার প্রতি চাহিয়া দেখ, এখনো কি সেইরূপ দেখিতেছ? সেই সামান্য অপরাধে ত্যাগ করিয়াছ। এবার আমায় ত্যাগ করিলে আর আমি বাঁচিব না। আমার কি ক্ষমা করিবে না"?

নীরদের চক্ষে এক নূতন আলোক জ্বলিয়া উঠিল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বাহু বাড়াইয়া সেই ক্ষীণ দেহভার আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন। এতদিনে দুইটি অশান্ত হৃদয় শান্ত হইল।

এমন সময় সহসা দূরে পদশব্দ হওয়ায়, ঊষা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। দ্বার খুলিয়া উমাকান্ত বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন

"লক্ষ্মী ছাড়া চাকরগুলো একা রাখিয়া পলাইয়াছে! ঔষধ খাওয়াবার সময় ডাকিতে বলিয়াছিলাম, তা আর ডাকিতে পারে নাই।" গৃহে প্রবেশ করিয়াই তিনি ঊষাকে দেখিয়া এতদূর বিস্মিত হইলেন যে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার বাক্যস্ফূরণ হইল না। তাহার পর দেখিলেন নীরদ শয্যায় শয়ন করিয়া জাগিয়া আছেন, তিনি কহিলেন

"একি নীরদ! এখনো ঘুমাওনি, সেকি?"

"ঘুমাইয়াছিলাম বই কি, এই মাত্র উঠিলাম।"

"এখন কেমন বোধ হইতেছে?"

"আমার ত কোন যন্ত্রণা নাই।"

"তবে ডাক্তারেরা যে বলিল ব্রেণে আঘাত লাগিয়াছে, সাবধানে রাখিতে।"

"সেটা বোধ হয় ডাক্তারের হইয়াছিল, আমার ত ব্রেণ বেশ পরিষ্কার বোধ হইতেছে।"

তাহার পর উমাকান্ত বাবু উষার প্রতি চাহিয়া বলিলেন

"এইবার এই ঔষধটা খাওয়াইয়া দাও ত মা। তা তুমি যখন এখানে রয়েছ, তখন অন্য কোনও লোকের আবশ্যক নাই। তা যাই হোক নীরদকে বেশী কথা কইতে দিও না।"

সলজ্জে উষা ঔষধের শিশি হাতে লইয়া মুখ নত করিল। কর্ত্তা ভিতরে গৃহিণীর সন্ধানে গিয়া দেখিলেন গৃহিণী নিদ্রায় অচেতন। তিনি ঠেলা দিয়া উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কি গোখুব ত ঘুম হচ্ছে, উষা কোথায়?"

"কেন? ঘুমিয়ে আছে।"

"একবার দেখ ত কি কচ্ছে।"

কেন?"

"একটা বিশেষ দরকার আছে।"

গৃহিণী নিদ্রার ঘোরে উঠিয়া উষার শয্যায় হাত দিয়া দেখিলেন শয্যা শূন্য। তিনি ভীত হইয়া বলিলেন "সে আবার কোথায় গেল, এ বিদেশে এসে ত আমার আর হাত পা চলে না।"

"যার জন্য এত ফাঁদ পেতেছিলে, তাত সার্থক হল।"

"সে আবার কি?"

"উষা জামাইয়ের কাছে।"

"সত্যি?" গৃহিণীর আর বাক্য সরিল না।

"তা ছাড়া সে কি কর্ব্বে বল? মা ত মেয়ের মন বুঝে কাজ কর্ত্তে পারেনি, কাজেই সে নিজে গেছে।"

"আমি কি কর্ব্ব বল? এসেই ত এই দুর্ঘটনা হল।"

"তোমার কলে কি কর্ত্তে?"

"ছুটে বাইরে যেতুম।"

"সেও তাই গেছে, তোমারিত মেয়ে।"

"তুমি কি করে জান্‌লে?"

"আমি এই মাত্র নীরদকে ঔষধ দিতে গিয়া দেখি উষা সেই ঘরে, ডাক্তারেরা বড় মিছে ভয় দেখাতে পারে যা হোক্।"

"যাই হোক্ বাবা সত্য নারায়ণের কৃপায় আমার সাধ পূর্ণ হল, বাড়ী গিয়াই খুব ঘটা করে পূজা দেব। মা সিদ্ধেশ্বরী আমার কামনা সিদ্ধ করিলেন, তেল সিঁদুরে আমি নিজে গিয়ে মার পূজো দিয়ে আসব। মা কালী আমার নীরদের প্রাণ রক্ষা করেছেন, বুক চিরে রক্ত দিয়ে আসব। ভগবান্ আমার উষা নীরদকে সুখী করুন" এই বলিয়া গৃহিণী উদ্দেশে জগদীশ্বরের চরণে প্রণাম করিলেন। তাহার কয়েক দিন পরে উমাকান্ত বাবু উষাকে লাহোরে রাখিয়া সস্ত্রীক দেশে ফিরিলেন।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

গীতা-সার ব্যাখ্যা।

হিন্দু শাস্ত্রের সারের সার ভগবদ্‌গীতা। এই ভগবদ্‌গীতা যাঁহারা অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটী কথার মধ্যে ইহারও সার কথা আবার দেখিতে পান। যখন ভগবান্ অর্জ্জুনকে যোগ অভ্যাস করিবার উপদেশ দিতেছেন, কেন না যোগেতেই সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়, তখন "ব্রাহ্মীস্থিতি" নামক একটী অপূর্ব্ব অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই জীবন্মুক্তির অবস্থা এবং ধর্ম্ম সাধনের পরিণাম।

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নাঞ্চং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং গচ্ছতি।"

হে পার্থ! এই ব্রাহ্মী স্থিতি, এ অবস্থা পাইলে আর জীব মোহে মুহ্যমান হয় না। অন্তকালেও এই অবস্থায় থাকিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণ অর্থাৎ ব্রহ্মে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

এই ব্রাহ্মী স্থিতি কিরূপে লাভ হয়, তাহারই সূচনাস্বরূপ কয়েকটী শ্লোক আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে; ইহার মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মের সারতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।১

ধর্ম্মের অধিকারী হইবার জন্য প্রথম সাধন সর্ব্বপ্রকার মনোগত কামনা প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ আর পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মায় আত্মার তুষ্টি লাভ। যে ব্যক্তি এই প্রকার অনুষ্ঠান করিতে পারেন, গীতায় তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়াছেন।

মানবের কামনা নানাবিধ ও অসংখ্য। (১) ঐহিক কামনা—ধন, মান, যশ, প্রভুত্ব, স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি লাভের কামনা। (২) পারত্রিক কামনা—স্বর্গবাস, সুরা, অপ্সরা, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য। এক একটী কামনা মনের এক একটী অশান্তির কারণ। কামনার বস্তু না পাইলে অশান্তি; তাহা উপার্জ্জন করিবার জন্য কত শ্রম ক্লেশ গঞ্জনা লাভ। তাহা পাইলেও ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় তাহা আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কামনা পূর্ণ হইলেও শান্তি নাই—আবার পাছে তাহা হারাইতে হয় এই আশঙ্কায় মন অস্থির থাকে। আর সে বস্তুর বিনাশ হইলে ত শোক অবশ্যম্ভাবী। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির কত বিষয় এবং সেই সকলের জন্য কত কামনা!! এই সকল বাসনা—কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। কেবল বাহিরে এ সকলের বিষয় পরিত্যাগ করিলে হইবে না—মনোগত যে বাসনা, তাহাও বৈরাগ্যানলে দগ্ধ করিতে হইবে। বনে গিয়া একব্যক্তি ত্যাগী ও বৈরাগী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু অন্তরে যদি বিষয়কামনা থাকে, তবে সে কামী। কামনার বিষয়ে পরিবৃত হইয়াও যে ব্যক্তি কামনাশূন্য, সেই প্রকৃত বৈরাগী। এই জন্য মনে—অন্তরে—হৃদয়ে যেখানে কামনার মূল,

সেখান হইতে তাহাকে সমূলোৎপাটিত করিতে হইবে। এককালে এই কামনা-অভাবের (negative) ভাব লাভ করা অসম্ভব। বিষয়কামনার পরিবর্ত্তে ব্রহ্ম-কামনা মন অধিকার করিলে নিষ্কাম হওয়া সম্ভব হয়। "অকামবিষ্ণুকামনা।" এইজন্য গীতা ভাবপক্ষে (positive side) বলিতেছেন—জীবাত্মা সেই আত্মারাম আনন্দধাম প্রত্যগাত্মাকে পাইয়া পরিতুষ্ট হইলে তবে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। ভ্রমর যেমন মধু অন্বেষণে এখানে সেখানে চঞ্চল হইয়া কোলাহল করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু যখন মধুপূর্ণ পুষ্প পায়, তখন তাহাতে বসিয়া তদ্গত হইয়া নীরবে মধু পান করে; জীব সেইরূপ সুখের কামনায় চঞ্চল হইয়া কোলাহল করে, এবং নানা বিষয় আস্বাদন করিয়া বেড়ায়, কিন্তু যখন রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, তখন স্থির ও শান্ত হইয়া তাঁহারই চরণ-কমল-সুধা পানে নিযুক্ত হয়।

হৃদয়ের ধন পরম রতন তোমায় পেলে
প্রাণ জুড়ায়,
সুখে মন শান্তিতে মগন অতলে ডুবিয়া
যায়।
কামনা আবর্ত্তে ঘুরি, বিপাকে মন জড়ায়,
তোমার চরণ যে লয় শরণ নিরাপদ কর
তায়।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভক্তসঙ্গে—হরিকথা প্রসঙ্গে

[ভাব, মহাভাবের গূঢ়তত্ত্ব]

শ্রীযুত মহিমাচরণ ইত্যাদি ছাড়া কয়েকটী কোন্নগরের ভক্ত এসেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ঠাকুর রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে কিয়ৎকাল বিচার করিয়াছিলেন।

কোন্নগরের ভক্ত। (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি) মহাশয়! শুনলাম যে আপনার ভাব হয়,—সমাধি হয়। কেন হয় আমাদের বুঝিয়ে দিন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীমতীর মহাভাব হ'তো—সখীরা কেহ ছুঁতে গেলে অন্য সখী বোলতো, 'কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছুঁয়নি—এঁর দেহ মধ্যে এখন কৃষ্ণ বিলাস করছেন'। "ঈশ্বর অনুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জলটা নড়ে—তেমন মাছ হলে জল তোলপাড়্ করে। তাই ভাবে হাঁসে কাঁদে নাচে গায়। অনেকক্ষণ ভাবে থাকা যায় না। আয়নার কাছে বসে কেবল মুখ দেখিলে লোকে পাগল মনে করে।

কোন্নগরের ভক্ত। শুনেছি মহাশয় ঈশ্বর দর্শন করে থাকেন। তাহলে আমাদের দেখাইয়া দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। সবই ঈশ্বরাধীন—মানুষে কি করবে? তাঁর নাম করতে করতে কখন ধরা পড়ে—কখন পড়ে না। তাঁর

ধ্যান করতে করতে এক এক দিন বেশ উদ্দীপন হয়—আবার এক এক দিন কিছুই হলো না।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বর দর্শন]

"কর্ম্ম চাই। এক দিন ভাবে হালদার পুকুর * দেখলুম। দেখি একজন ছোট লোক পানা ঠেলে জল নিচ্ছে, আর জল হাতে তুলে এক একবার দেখ্‌ছে। যেন দেখালে পানা না ঠেলিলে জল দেখা যায় না—কর্ম্ম না করলে ভক্তি লাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ধ্যান জপ এইটি কর্ম্ম—তাঁর নামগুণ কীর্ত্তনও কর্ম্ম—দান যজ্ঞ এই সব কর্ম্ম।

"মাখন যদি চাও তবে দুধকে দই পাততে হয়। তার পর নির্জ্জনে রাখতে হয়। তবে মাখন তৈয়ারি হয়।

মহিমাচরণ। আজ্ঞা হাঁ—কর্ম্ম চাই বই কি। অনেক খাটতে হয়, তবে লাভ হয়। পড়তেই কত হয়! অনন্তশাস্ত্র!

[আগে বিদ্যা (জ্ঞান বিচার) না আগে ঈশ্বর লাভ?] †

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)। শাস্ত্র কত পড়্‌বে? শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করিবার চেষ্টা কর। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছু কর্ম্ম কর। গুরু না থাকেন, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি যেমন তিনিই জানিয়ে দেবেন।

"বই পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পঁহুছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল হো হো শব্দ। হাটে পঁহুছিলে আর এক রকম। তখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবে—শুনতে পাবে। 'আলু নাও পয়সা দাও' স্পষ্ট শুনতে পাবে।

"সমুদ্র দূর হোতে হো হো শব্দ করছে, কাছে গেলে কত জাহাজ যাচ্ছে, পাখী উড়ছে, ঢেউ হচ্ছে দেখতে পাবে।

"বই পড়ে ঠিক্ অনুভব হয় না। অনেক তফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই, শাস্ত্র, সায়েন্‌স্ (Science) সব খড়কুটো বোধ হয়।

"বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ এ আগে জানবার জন্য অত ব্যস্ত কেন? চাকরদের কাছে গেলে তারাও দাঁড়াতে দেয় না—কোম্পানীর কাগজের খপর কি দেবে? কিন্তু যোসো করে বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ কর—তা ধাক্কা খেয়েই হোক আর বেড়া ডিঙ্গিয়েই হোক—তখন কত বাড়ী, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ তিনিই বলে দেবেন। বাবুর সঙ্গে আলাপ হলে আবার চাকর, দ্বারবান্ সব সেলাম্ করবে। (সকলের হাস্য)।

[কর্ম্মযোগ ও ঈশ্বরলাভ]

একজন ভক্ত। এখন বড় বাবুর সঙ্গে কিসে আলাপ হয়?

---

* হালদার পুকুর—হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপুকুর গ্রামে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাড়ী। তাহার সম্মুখে হালদার পুকুর একটী বড় দীঘী বিশেষ।

† "Seek ye first the kingdom of heaven and all other things shall be added unto you"—*Mathew.*

শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই কর্ম্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জ্জনে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর দেখা দাও বলে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। কামিনী-কাঞ্চনের জন্য পাগল হয়ে বেড়াতে পার! তবে তাঁর জন্য একটু পাগল হও। লোকে বলুক যে অমুক ঈশ্বরের জন্য পাগল হয়ে গেছে। দিন কতক না হয় সব ত্যাগ করে তাঁকে একলা একলা ডাকো।

"শুধু তিনি আছেন বলে বসে থাক্‌লে কি হবে? হালদার পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাক্‌লে কি মাছ পাওয়া যায়? চার করো, চার ফ্যালো, ক্রমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে, আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয় তো মাছটার খানিকটা একবার দেখা গেলো—মাছটা ধপাও করে উঠলো। যখন সব দেখা গেল, তখন কত আনন্দ!

"দুধ্‌কে দই পেতে মন্থন করলে তবে তো মাখন পাবে!

(মহিমাচরণের প্রতি) এতো ভাল বালাই হলো! ঈশ্বরকে দেখিয়ে দাও, আর উনি চুপ করে বসে থাক্‌বেন! মাখন তুলে মুখের কাছে ধরো! (সকলের হাস্য)।

"ভালবালাই—মাছধরে হাতে দাও!

"একজন রাজাকে দেখ্‌তে চায়। রাজা আছেন সাত্‌ দেউড়ীর পরে। প্রথম দেউড়ী পার না হতে হতে বলে 'রাজা কই'! যেমন আছে একটা একটা দেউড়ী তো পার হতে হবে!

[ঈশ্বর লাভের উপায়—ব্যাকুলতা।]

মহিমাচরণ। কি কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কর্ম্মের দ্বারা তাঁকে পাওয়া যাবে আর এ কর্ম্মের দ্বারা পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর কৃপার উপর সব নির্ভর। তবে ব্যাকুল হয়ে কিছু কর্ম্ম করে যেতে হয়। ব্যাকুলতা থাকলে হয়ে যায়। ব্যাকুলতা থাকলে তাঁর কৃপা হয়।

একটা সু-যোগ হওয়া চাই—সাধুসঙ্গ, বিবেক, সদ্‌গুরু লাভ। হয় তো একজন বড় ভাই সংসারের ভার নিলে—হয় তো স্ত্রীটী বিদ্যাশক্তি বড় ধার্ম্মিকা, কি বিবাহ আদতেই হ'ল না সংসারে বদ্ধ হতে হ'ল না, এই সব যোগাযোগ হলে হয়ে যায়।

"একজনের বাড়ীতে ভারি অসুখ—যায় যায়। কেউ বল্লে, 'মড়ার মাথার খুলিতে অমুক নক্ষত্রে বৃষ্টি পড়বে। সেই বৃষ্টির জল থাক্‌বে, আর একটা সাপ ব্যাঙ্‌কে তেড়ে যাবে, ব্যাঙ্‌কে ছোবল মারবার সময় ব্যাঙ্‌টা যাই লাফ্‌ দিয়ে পলাবে, অমনি সেই সাপের বিষ মড়ার মাথার খুলিতে পড়ে যাবে; সেই বিষের ঔষধ করে যদি খাওয়াতে পার, তবে বাঁচে। তখন যার বাড়িতে অসুখ, সেই লোক দিনক্ষণ নক্ষত্র দেখে বাড়ী থেকে বেরুলো, আর ব্যাকুল হয়ে ঐ সব খুঁজতে লাগলো। মনে মনে ঈশ্বরকে ডাক্‌ছে—ঠাকুর তুমি

যদি যোট্ পাট্ করে দাও তবেই হয়। এই রূপে যেতে যেতে সত্য সত্যই দেখতে পেলে একটা মড়ার মাথার খুলি পড়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে এক পসলা বৃষ্টি হ'ল। তখন সে ব্যক্তি বল্ছে, 'হে গুরুদেব মড়ার মাথার খুলিও পেলুম, আবার সেই নক্ষত্রে বৃষ্টিও হ'ল, সেই বৃষ্টির জলও ঐ খুলিতে পড়েছে, এখন কৃপা করে আর কয়টার যোগাযোগ করে দাও'। ব্যাকুল হয়ে ভাবছে। এমন সময়ে দেখে একটা বিষধর সাপ আস্ছে। তখন সে লোকটীর ভারি আহ্লাদ হ'ল। আর এতো ব্যাকুল হ'ল যে বুক দুড়্ দুড়্ করতে লাগল; আর বলতে লাগল, হে গুরুদেব! এবার সাপও এসেছে অনেক গুলির যোগাযোগ হ'ল, কৃপা করে এখন আর যেগুলি বাকি আছে, সে গুলি করিয়ে দাও। বলতে বলতে ব্যাঙও এলো, সাপটা ব্যাঙ তাড়া করে যেতেও লাগল, মড়ার মাথার খুলির কাছে এল। যাই ছোবল দিতে যাবে, অমনি ব্যাঙটা লাফিয়ে ওদিকে গিয়ে পড়ল, আর বিষ অমনি খুলির ভিতর পড়ে গেল। তখন লোকটী আনন্দে হাত তালি দিয়ে নাচ্তে লাগল।

"তাই বলছি, ব্যাকুলতা থাকলে সব হয়ে যায়।"

[ঈশ্বরলাভ ও ত্যাগ; ঠিক্ সন্ন্যাস।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মন থেকে সব ত্যাগ না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না। যে সাধু, সে সঞ্চয় করতে পারে না। "সঞ্চয় না করে পঞ্ছী আউর দরবেশ" পাখী আর সাধু সঞ্চয় করে না। এখানে ভাব—হাতে মাটী দেবার জন্য মাটী নিয়ে যেতে পারি না। বেটুয়াটা করে পান আনবার যো নাই। হৃদে যখন বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে, তখন এখান থেকে কাশী চলে যাবো মতলব হ'ল। ভাবলুম, কাপড় লব—কিন্তু টাকা কেমন করে লব? আর কাশী যাওয়া হ'ল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি) তোমরা সংসারী—তোমরা এও রাখ ও ও রাখ। সংসারও রাখ, ধর্ম্মও রাখ। মহিমা। এ কি আর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকাই মাটী মাটীই টাকা, টাকাই মাটী এই বিচার করতে করতে যখন টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন একটু ভয় হ'ল। ভাবলুম, 'আমি কি লক্ষ্মীছাড়া হলুম! মা লক্ষ্মী যদি খাঁট্ বন্ধ করে দেন, তা হ'লে কি হবে! তখন হাজরার মত পাটয়ারি করলুম। বল্লুম, মা তুমি যেন হৃদয়ে থেকো। একজন তপস্যা করাতে ভগবতী সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন, তুমি বর নাও। সে বল্লে মা যদি বর দিবেন তবে এই করুন যেন আমি নাতির সঙ্গে সোনার থালে ভাত খাই। এক বরেতে নাতি, ঐশ্বর্য্য, সোনার থাল সব হ'ল। (সকলের হাস্য)।

[সংসারী ও ত্যাগী, বদ্ধ ও মুক্ত]

"মন থেকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ হলে ঈশ্বরে মন যায়, তাঁতে মন গিয়ে লিপ্ত

হয়। যিনিই বদ্ধ, তিনিই মুক্ত হতে পারেন।

"ঈশ্বর থেকে বিমুখ হলেই বদ্ধ—নিক্তির নীচের কাঁটা উপরের কাঁটা থেকে তফাৎ হয় কখন? যখন নিক্তির বাটীতে কামিনী কাঞ্চনের ভার পড়ে।

"ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়ে কেন কাঁদে? গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম'। ভূমিষ্ঠ হয়ে এই বলে কাঁদে—কাঁহা এ, কাঁহা এ, কাঁহা এ—এ কোথায় এলুম, ঈশ্বরের পাদপদ্ম চিন্তা করছিলাম, এ আবার কোথা এলুম।

"তোমাদের পক্ষে মনে ত্যাগ—সংসার অনাসক্ত হয়ে কর। কামিনীকাঞ্চন বাহিরে ত্যাগ করতে হবে না।

[সংসার ত্যাগ]।

মহিমা। তাঁর উপর মন গেলে আর কি সংসার থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। সে কি? সংসারে থাকবে না তো কোথায় যাবে?

"আমি দেখছি যেখানে থাকি রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা।

"রামচন্দ্র গুরুর কাছে জ্ঞান লাভ করবার পর বল্লেন, আমি সংসার ত্যাগ করবো। দশরথ তাঁকে বুঝাইবার জন্য বশিষ্ঠকে পাঠালেন। বশিষ্ঠ দেখলেন রামের তীব্র বৈরাগ্য। তখন বল্লেন, 'রাম তুমি আগে আমার সঙ্গে বিচার কর, তার পর সংসার ত্যাগ কোরো। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি সংসার কি ঈশ্বর ছাড়া? তা যদি হয়, তাহলে তুমি ত্যাগ কর'। রাম দেখলেন যে ঈশ্বরই জীব জগৎ সব হয়েছেন। তখন চুপ করে রইলেন।

"সংসারে কাম ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়—নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়—আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে কল্লেই সুবিধা। তাই গৃহে থেকে যুদ্ধই ভাল—খাওয়া দাওয়াতে ধর্ম্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত প্রাণ—অন্নের জন্য ঘোরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। তাই গৃহে কেল্লার ভিতরে থেকে যেন যুদ্ধ করা।

"আর সংসারে থেকো ঝড়ের এঁটো-পাতা হয়ে। ঝড়ের এঁটোপাতাকে কখন ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়, কখন আঁস্তা-কুড়ে। হাওয়া যেদিকে যায়, পাতাও সেই দিকে যায়। কখন ভাল জায়গায়, কখনও মন্দ জায়গায়! তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছে, ভাল এখন সেই খানেই থাকো—আবার যখন সেখান থেকে তুলে ওর চেয়ে ভাল জায়গায় নিয়ে ফেল্‌বেন, তখন যা হয় হবে।

[সংসার ও আত্মসমর্পণ (Resignation); 'রামের ইচ্ছা']।

"সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পন করে—তাঁকে আত্ম-সমর্পণ কর—তাহলে আর কোন গোল থাক্‌বে না। তখন দেখবে তিনিই সব কর্‌ছেন। সবই 'রামের ইচ্ছা'।

একজন ভক্ত। 'রামের ইচ্ছা' গল্পটী কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোন এক গ্রামে একটী তাঁতী থাকে। বড় ধার্ম্মিক, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে, আর ভালবাসে। তাঁতী হাটে গিয়ে কাপড় বিক্রী করে। খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে, "রামের ইচ্ছা সুতার দাম ১ টাকা, রামের ইচ্ছা মেহান্নতের দাম ।০, রামের ইচ্ছা মুনফা ৵০; কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১।৵০।" লোকের এ তো বিশ্বাস যে তৎক্ষণাৎ দাম ফেলে দিয়ে কাপড় কিনে নিত। লোকটী ভারি ভক্ত, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে ঈশ্বরচিন্তা করে, তাঁর নামগুণ কীর্ত্তন করে। একদিন অনেক রাত হয়েছে, লোকটীর ঘুম হচ্চে না, বসে আছে—এক একবার তামাক খাচ্চে—এমন সময় সেই পথ দিয়ে একদল ডাকাত্ ডাকাতি করতে যাচ্চে। তাদের একজন মুটের অভাব হওয়াতে ঐ তাঁতীকে এসে বল্লে, 'আয় আমাদের সঙ্গে'—এই বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্ লো। তার পর একজন গৃহস্থের বাড়ী গিয়ে ডাকাতি কর'ল। কতকগুলো জিনিস ঐ তাঁতীর মাথায় দিল। এমন সময়ে পুলিস্ এসে পড়'ল। ডাকাতরা পলাল—কেবল তাঁতীটী মাথায় মোট ধরা পড়্‌ল। সেদিন তাকে রাত্রি-হাজতে রাখা হ'ল। তার পর দিন ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে বিচার। কিন্তু গ্রামের লোক সব জান্‌তে পেরে সকলে এসে উপস্থিত। তারা সকলে বল্লে, "হজুর! এ লোক কখন ডাকাতি করতে পারে না।" সাহেব তখন তাঁতীকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি গো তুমি কি হয়েছে বল।"

তাঁতী বলিল, "হজুর! রামের ইচ্ছা আমি রাত্রে ভাত খেলুম। তার পর, রামের ইচ্ছা, আমি চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছি; রামের ইচ্ছা অনেক রাত হ'ল। আমি, রামের ইচ্ছা, ভগবানের নামধ্যান করিলাম আর তাঁর নাম গান কর্‌ছিলাম। এমন সময়ে রামের ইচ্ছা একদল ডাকাত সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। রামের ইচ্ছা তারা আমায় ধরে টেনে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা তারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি কর্‌ল। রামের ইচ্ছা তারা আমার মাথায় মোট দিল। এমন সময়, রামের ইচ্ছা, পুলিস্ এসে পড়্‌ল। রামের ইচ্ছা ডাকাতেরা পালিয়ে গেল। আর রামের ইচ্ছা আমি ধরা পড়লুম। তখন রামের ইচ্ছা, পুলিশের লোকেরা আমায় হাজতে দিল। আজ সকালে, রামের ইচ্ছা হজুরের কাছে এনেছে।" অমন ধার্ম্মিক লোক দেখে সাহেব তাঁতীটীকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বল্লে, "রামের ইচ্ছা আমায় ছেড়ে দিয়েছে।"

"সংসার করা, সন্ন্যাস করা সবই 'রামের ইচ্ছা।' তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারের কাজ কর। তা নাইলে আর কিই বা করবে?

"কেরাণী একজন জেলে গিয়েছিল। জেল খাটা শেষ হলে সে জেল থেকে বেরিয়ে এ'ল। এখন জেল থেকে এসে কি সে কেবল ধেই ধেই করে নাচ্‌বে নাকি? না সে এসে কেরাণীগিরিই করবে?

"সংসারে যদি জীবন্মুক্ত হয় সে মনে করলে অনায়াসে সংসারে থাকতে পারে। তার জ্ঞান লাভ হয়েছে—তার এখান সেথান নাই। তার সব সমান। যাঁর সে সেখানে আছে, তাঁর সে এখানেও আছে। স্ত্রী পুত্র এরা তাঁরই জিনিস্—এই বলে তাদের সেবা করে। ছেলেদের গোপাল ভাবে সেবা করে।

[শ্রীকেশব সেন ; ও জীবনমুক্তি]।

"যখন কেশব সেনকে বাগানে প্রথম দেখলুম বলেছিলাম, 'এঁরই ল্যাজ্ খসেছে, দেখ্ ছি'। সভাশুদ্ধ লোক হেঁসে উঠ্ ল। কেশব বল্লে 'তোমরা হেঁসো না, এর কিছু মানে আছে, এঁকে জিজ্ঞাসা করি'। আমি বল্লাম, যত দিন বেঙাচির ল্যাজ্ না খসে, ততদিন কেবল জলে থাকতে হয়, ডাঙ্গায় উঠে ডাঙ্গায় বেড়াতে পারে না। যাই ল্যাজ খসে, অমনি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে—তখন জলেও থাকে আবার ডাঙ্গায়ও থাকে। তেমনি মানুষ যত দিন অবিদ্যার ল্যাজ্ না খসে, তত দিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিদ্যায় ল্যাজ্ খস্লে—জ্ঞান হ'লে—তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে। আবার ইচ্ছা কর্লে সংসারেও থাকতে পারে।

(ক্রমশঃ)।

ত্রয়যুদ্ধের সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পৌরাণিক কাব্য।

প্রথম প্রস্তাব। মুখবন্ধ।

রামায়ণ ও মহাভারত আমাদিগের অবিনাশী সম্পত্তি। যতদিন সংস্কৃত সাহিত্য অবনীমণ্ডলে অধিষ্ঠিত থাকিবে, ভারতের এই অমূল্য মণিদ্বয় ততদিন পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল কিরণ জাল বিকীর্ণ করিয়া ভুবন আলোকিত করিবে। ইহাদিগের বিবৃত ধর্ম্ম, নীতি, তত্ব, দর্শন, ব্যবহার শাস্ত্র লোকতত্ব, আপদ্ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশ সকল চিরকাল আলোচ্য—চিরকাল প্রতিপাল্য। ইহাদিগের বর্ণিত আখ্যায়িকা সকল নীতি গর্ভ, কৌতুকাবহ ও চিরানুকরণীয় এবং ভারতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত। আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের ইতিহাস জানেন না এরূপ অতি অল্প ব্যক্তিই আছে। পণ্ডিত কৃত্তিবাস ও শ্রদ্ধাবান্ কাশীরাম দাস বঙ্গবাসীর অতি আদরের সামগ্রী। ইহাদিগের কল্যাণে বঙ্গের আপামর সাধারণে সকলেই উক্ত মহাকাব্য দ্বয়ের অনুবাদ বা সারাংশ পাঠ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আদিকবি বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণের রচয়িতা। বেদ ব্যতীত বোধ হয় পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা প্রচীন গ্রন্থ আর নাই। ইহা ভারতের বিবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হওয়াতে তত্রতা সকলেরই পরিচিত ; ইদানীং দুই একটি য়ুরোপীয় ভাষাতেও অনুবাদিত হইয়াছে। সংস্কৃত

ভাষায় ইহার অনুসরণে ও ছায়াবলম্বনে আরও কয়েকখানি রামায়ণ রচিত হয়, কথক ও গাথকগণ তৎসমুদয় মিশ্রিত করিয়া মূলগ্রন্থের অনেক বৈলক্ষণ্যও সংঘটন করিয়াছেন। পণ্ডিত কৃত্তিবাসই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ বা রচনা করেন। ইহা বাল্মীকি কিম্বা অন্য কোন রামায়ণের অবিকল অনুবাদ নহে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ ও বেদব্যাস প্রণীত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণ এবং মহর্ষি জৈমিনি কৃত ভারত (অশ্বমেধ পর্ব্ব) প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। কৃত্তিবাস পণ্ডিত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার অনুবাদ অনেকাংশে মূলের অনুরূপ। তিনি আবার কবি ছিলেন, তাই স্থানে স্থানে কল্পনার উচ্ছ্বাসও অনুভূত হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম তত্ত্ববিষয়ক জটিল ও দুর্বোধ অংশ সকল পরিত্যাগ বা প্রচলিত প্রবাদানুমত ব্যাখ্যা করাতে অনেকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ সংস্কার অনুদার ও ভ্রমাত্মক এবং তিনি যখন পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত, তখন ইহা নিতান্ত অবজ্ঞেয়। আজি বঙ্গদেশ তাঁহার প্রসাদেই রামায়ণ সুধাপানে অধিকারী। শ্রদ্ধাস্পদ কাশীরাম স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রমুখাৎ কথকতা শুনিয়া প্রচলিত সরল ভাষায় ভারত রচনা করিয়াছেন—অনুবাদ করেন নাই। কাশীরামও কবি ছিলেন। তাঁহার ভণিত ভারতের স্থানে স্থানে কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন লোকশিক্ষার্থই মহাকাব্য মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে নিগূঢ় ভাব সকল এরূপ কৌশলে সংন্যস্ত হইয়াছে যে মহা মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও জ্ঞানবৃদ্ধ যোগিগণও তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ নহেন। কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ বা ভগবদ্গীতাধ্যায় গুরূপদেশ ভিন্ন সম্যক্ বোধগম্য হয় না। শান্তিপর্ব্বোক্ত আপদ্ধর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায় অতি অল্প লোকেই বুঝিতে বা ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, সুতরাং কাশীরামও তাহা করিতে পারেন নাই। তিনি রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ও পরিত্যাগ করিয়াছেন। মোক্ষধর্ম্মের যতটুকু ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও মূল সঙ্গত নহে। কথকেরা লোকরঞ্জনার্থ দুরূহ বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে জৈমিনি ভারত, হরিভক্তি বিলাস ও অন্যান্য পুরাণ হইতে যে সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিতেন, কাশীরামের ভারতে তাহাই উদ্ধৃত, বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিশেষতঃ কাশীরাম যে সমগ্র ভারত রচনা করিয়াছিলেন, এরূপও বোধ হয় না, যদিও অষ্টাদশপর্ব্বেই তাঁহার নামের ভণিতা দৃষ্ট হয়। প্রচলিত প্রবাদ যে—

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥

যাহাই হউক দ্বৈপায়নের মহাভারতের সহিত কাশীরামের ভারতের সম্পূর্ণ ঐক্য

না থাকিলেও, ইহা অনেকটা তাহার অনুরূপই হইয়াছে বলিতে হইবে। কালী-প্রসন্ন সিংহ ও বর্দ্ধমানাধিপতি মহাতাবচন্দ্র কৃত অনুবাদের পূর্ব্বে সংস্কৃতানভিজ্ঞদিগের কাশীদাসের ভারতই একমাত্র সম্বল ছিল এবং অদ্যাপি সাধারণে ইহাদ্বারাই ভারতামৃত পান করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকে।

রামায়ণের ন্যায় ইলিয়াদ য়ূনানী জাতির অতুল সম্পত্তি। য়ূনানী মহাকবি হোমর এই মহাকাব্যের রচয়িতা। ইহার প্রকৃত নাম হোমেরস বা মিওনাইডিস (Homerus or Mœonides)। মহর্ষি বাল্মীকি নির্জ্জন তপোবনে ও সজন নগরে শিষ্যগণ দ্বারা মহাগীত রামায়ণ গান করাইতেন। ইহা শ্রবণে সকলেই পুলকিত হইত। হোমর ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে ট্রয়গীত গান করিয়া বেড়াইতেন। ধনী দীন রাজা প্রজা গৃহস্থ আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই মহা সঙ্গীত পানে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। কিম্বদন্তী যে হোমর অন্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানচক্ষু অতি উজ্জ্বল ছিল। অধুনা তাঁহার মহাকাব্য য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইহা য়ূনানী জাতির মহাপুরাণ। মহর্ষি মহাকবি বেদব্যাস যেরূপ রামায়ণের অনুবৃত্তিস্বরূপ মহাভারত রচনা করিয়াছেন, রোমীয় মহাকবি বার্জ্জিলও সেইরূপ মহাকাব্য ইলিয়দের অনুবৃত্তিস্বরূপ ইনিয়দ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত নাম বারজিলিয়স মারো (Virgilius Maro) রামায়ণ ও মহাভারত উভয় মহাকাব্য অনুশীলন ব্যতীত যেমন সম্যক্-পুরাণজ্ঞান অসম্ভব, সেইরূপ ইলিয়দ ও ইনিয়দ উভয় কাব্য অধ্যয়ন না করিলে য়ুনানী মহাপুরাণেও সম্যক্ ব্যুৎপত্তি জন্মে না। মূল ইলিয়দ, গ্রীকভাষায় এবং ইনিয়দ লাটিন ভাষায় বিরচিত। ইহাদের য়ুরোপীয় অনেক ভাষায় ভূরি অনুবাদ আছে। ইংরাজী ভাষাতে ইহাদের অনেকগুলি অনুবাদ দৃষ্ট হয়; কতকগুলি মূলের অনুরূপ, কতকগুলি মূল অবলম্বনে বিরচিত, আবার কোন কোন খানি কেবল সারসংগ্রহ মাত্র।

ত্রয়যুদ্ধই গ্রীক পুরাণের প্রধান ঘটনা। ইলিয়দ, ওদেশী, ইনিয়দ প্রভৃতি মহাকাব্য সকল ইহার আংশিক ইতিবৃত্ত বিবৃতি করিয়া বিরচিত। আমরা উক্ত মহাকাব্য সকলের অনেকগুলি অনুবাদ ও পৌরাণিক অভিধানের সাহায্যে এই সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস সঙ্কলন করিলাম; আশা করি পাঠিকাবর্গ এতৎপাঠে তৃপ্তিলাভের সহিত য়ুনানী পুরাণ পাঠের ফললাভেও সমর্থ হইবেন।

(ক্রমশঃ)।

টেলিপাথি বা ঝাড়ন মন্ত্র।

(দূরজ্ঞান)।

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী নব্য সম্প্রদায় বিশ্বাস না করিলেও আমাদিগের পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে হয় তো ঝাড়ন মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রভাব দর্শন করিয়াছেন। মাকড়সা চাটা, সাপে কামড়ান, অন্য প্রকার গরলজাত ঘা, (সাধারণ মতে) ডাইনের দৃষ্টি, ভূতাবেশ প্রভৃতি রোগে ঝাড়নমন্ত্র বিশেষ উপকারী। সে দিন একজন শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যিনি পূর্ব্বে এই সকল বিষয় কুসংস্কার বোধে বিশ্বাস করিতেন না, সম্প্রতি তাঁহার কন্যা ভূতাবিষ্ট হইয়া কেবল ঝাড়ন মন্ত্র প্রভাবে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। আমরা এ ঘটনা অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সুতরাং ইহা অবিশ্বাস করিতে পারি না। অনেক ওঝা যেমন ভূমিতলে চিত্রপাত করিয়া ঝাড়ন দ্বারা রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে; সম্প্রতি পল্ এড্ওয়ার্ডস্ নামক একজন মার্কিন ডাক্তার একটি আশ্চর্য্য উপায়ে এইরূপ রোগের চিকিৎসা করিয়াছেন। তিনি একখানি প্রকাণ্ড সংবাদ পত্রে (Light) লিখিয়াছেন যে "যখন আমি মেকসিকো নগরে চিকিৎসা কার্য্য করিতাম, একদা একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা আমার চিকিৎসা-প্রার্থিনী হইলেন। তিনি দারুণ শিরোরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, কেহই তাঁহার কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রথমে তাঁহার পীড়ার কারণ তিনি কোন প্রকারে কাহাকেও বুঝাইতে পারেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিতেন যে, তাঁহার প্রতিবাসিনী একজন মেক্সিকান্ স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার অসদ্ভাব আছে। সে একটী ক্ষুদ্র পুত্তলিকা ক্রয় করিয়া তাহার রবারের মস্তকে একটী আলপিন বিঁধিয়া "আমার মস্তক বিঁধিতেছে" বলিয়া প্রকাশ করিলেই আমার মস্তকে যেন সূচীবিদ্ধ হইয়া থাকে এবং অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়; এতদ্ভিন্ন আমি অন্য কোন কারণ জানি না।" অবশ্য এই ঘটনা বা কারণ অনেকে বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিন্তু আমার ধারণা ছিল যে এরূপ ব্যাপার অসম্ভব নহে। আমি তাঁহাকে কিছু প্রতীকারক ঔষধি দিয়া বিদায় করিলাম এবং বলিয়া দিলাম যে সেই দুষ্টা স্ত্রীলোক যাহাতে আর না তাঁহাকে উৎপীড়ন করে, শীঘ্রই তাহার উপায় করিব। রজনীতে আমার চিকিৎসালয়ে থাকিতে বলিয়া টেলিপাথি (দূরজ্ঞান) প্রভাবে মানসিক শক্তিদ্বারা আমি সেই মেকসিকান স্ত্রীলোকের মনের সহিত যোগ স্থাপন করিলাম এবং তাহাকে এই দুষ্কর্ম্ম হইতে শীঘ্র নিবৃত্ত হইতে অনুজ্ঞা করিলাম। বলা বাহুল্য যে আমি এই স্ত্রীলোকটীকে কখনও দর্শন করি নাই এবং তাহার সহিত আমার পরিচয়ও নাই। পর দিন রোগী

আসিয়া অবগত করিল যে উক্ত দুষ্টা স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে, পুত্তলিকাটী ফেলিয়া দিয়াছে এবং আর কখন আমার অনিষ্ট করিবে না বলিয়াছে। মেক্‌সিকোর দুষ্টা স্ত্রীলোক এই প্রকার উপায়ে সচরাচর লোকদিগকে উৎপীড়ন করিয়া থাকে এবং আমিও এই প্রকারে অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। একদা এই সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের অর্থকৃচ্ছ্র হইয়াছিল। তাহার আত্মীয় কোন ধনীর নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, অথচ স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিতে কুণ্ঠিত হইয়া আমার উপদেশ প্রার্থনা করেন। আমি এই ব্যক্তিকে চিনিতাম না, সুতরাং মানসিক চিন্তা দ্বারা তাঁহার মনের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলাম। বলা বাহুল্য যে তিনি স্বয়ং পরদিন উক্ত মহিলার ভবনে উপস্থিত হইয়া আবশ্যক অর্থ প্রদান করিয়া গেলেন।" ডাক্তার এডওয়ার্ডস সাহসপূর্ব্বক প্রকটিত করিয়াছেন যে তিনি এই কার্য্য গুলি একমাত্র টেলিপাথি বা দূরজ্ঞানের দ্বারা সম্পাদন করিয়াছেন, কুসংস্কারাপন্ন হইয়া ভূত সেবা বা প্রেতাত্মার সাহায্যে অথবা কোন দুর্বোধ মন্ত্র-প্রভাবে নহে। *

* এপ্রেল মাসের থিওজফিষ্ট হইতে গৃহীত।

বিবাহিত জীবন।

মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ধর্ম্ম সাধন। বিবাহ দ্বারা মনুষ্য সেই ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তা লাভ করে। এই জন্য সকল শাস্ত্রেই বিবাহ এত পবিত্র বলিয়া বর্ণিত হয়। বিবাহ দ্বারা দুইটী অপূর্ণ মানব পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; উভয় মানবাত্মা একত্রীভূত হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। দম্পতীর প্রেম পবিত্র হইলে, তদুপরি ব্রহ্মাণ্ডপতির সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে। নিত্য তাঁহারা একাত্মা হইয়া ভগবানের পূজায় প্রাণ মন সমর্পণ করেন। বস্তুতঃ, মনুষ্য-জীবনে বিবাহ একটী অতি পবিত্র ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য! জীবনে এ কর্ত্তব্যটী সুসাধন করা অতিশয় সহজ ব্যাপার নয়। এ কর্ত্তব্যে সাধুতা, প্রেম, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হইতে পারে। এ কার্য্যক্ষেত্রের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, এ পবিত্র কার্য্যের জন্য আমরা নিজকে কতদূর উপযুক্ত করিয়াছি। নম্রতা, সুমিষ্ট ব্যবহার, অকপট ও বিশুদ্ধ প্রেমের সহিত পতির জীবনের সৎসঙ্গী হইতে পারিব কি না, সে বিষয় পূর্ব্বে চিন্তা করিতে হইবে। মনুষ্যের চরিত্র স্ত্রীলোক

দ্বারা গঠিত। কারণ তিনি শৈশবে জননীর স্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বাল্যে ভগিনীর সহিত ক্রীড়া প্রাঙ্গণে ক্ষেপণ পূর্ব্বক, যৌবনে পত্নীকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হন। এজন্যই জ্ঞানিগণ বলেন, মানবের মহত্ব ও ধর্ম্মভাবের বীজ সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী-চরিত্রে বপন আবশ্যক। স্নেহময়ী জননীর প্রভাব যেমন বালকের জীবনে কার্য্য করে, প্রেমময়ী ভার্য্যার প্রভাবও তেমনি যৌবনে পতির জীবনে কার্য্য করে। পতির হৃদয় পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমে পরাজিত হইলে, তাহার জীবনের উপর পত্নীর প্রভাব অধিকতর বিস্তারিত হইতে পারে।

অনেক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, অসদাচারী স্বামী পত্নীর পবিত্র প্রেমের প্রভাবে সৎপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন; আবার স্ত্রীর চরিত্রহীনতা হেতু অনেক সজ্জনকেও বিপথে গমন করিতে দেখা গিয়াছে। বাপ্পা রাউ, গ্যারিবল্ডী, নেপোলিয়ন, গ্লাডষ্টোন প্রভৃতি জগতের বিখ্যাত মনীষিবৃন্দ সকলেই পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। সচরাচর আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, বিপদে ও দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলে, পুরুষ অনেক সময় পত্নীর উৎসাহপূর্ণ বাক্যে প্রোৎসাহিত হন। সুতরাং এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, আমরা নিঃসংশয়রূপে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যৌবনে পত্নীর প্রভাব মনুষ্য-জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফল প্রসব করে। বিষম দারিদ্র এবং দুঃখপূর্ণ অবস্থাতেও সুনিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযমন প্রভৃতি দ্বারা তিনি জীবনের কষ্ট দূর করিয়া, প্রেম বিস্তার পূর্ব্বক সুখ বিধান করিতে পারেন। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমময়ী পত্নী আপনাকে বিস্মৃত হইয়া, পতির উন্নতিতে মগ্ন থাকেন এবং স্বামীর জীবন প্রবাহের সহিত আপনাকে ভাসমান করেন। জ্ঞানবতী ও বিচক্ষণা স্ত্রী স্বামীর সৎস্বভাবরূপ পুষ্পে যখন কোন অনিষ্টকারী কীট প্রবিষ্ট হইতে দেখেন, তখন তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন।

এই সকল কারণেই, জ্ঞানিগণ বলেন স্ত্রীলোকের পক্ষে এ জগতে উৎকৃষ্ট স্বামী লাভ করা স্বর্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। পুরুষের পক্ষেও এ জগতে সাধ্বী ও গুণবতী স্ত্রী প্রাপ্ত হওয়া স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ। যদি একে অপরকে সৎপথে আকর্ষণ করিতে নাও পারেন, তথাপি জীবন-পথের সৎসঙ্গী হইবেন সন্দেহ নাই। কার্য্যক্ষেত্রে উভয়ে উভয়কে সহায়তা করিয়া বিপদ লঘু করিতে পারেন, আনন্দ পরিবর্দ্ধন, তৎসঙ্গে মানসিক সদ্ভাব দৃঢ় করিতে পারেন।

দাম্পত্য জীবনের মঙ্গলের জন্য উভয়কে উভয়ের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। প্রত্যেকের চরিত্রেই কিছু না কিছু ত্রুটীর ন্যায় গুণ থাকা সম্ভব। স্বামীর চরিত্রে যে সকল সদ্ভাব বর্ত্তমান, স্ত্রী তাহা গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীর চরিত্রে যে সকল সদ্‌গুণ থাকে, স্বামী তাহার অংশভাগী হইবেন। আমরা অনেকেই স্বীয় অজ্ঞানতা বিষয়ে

অন্ধ ? দম্পতী পরস্পরে প্রকৃত প্রেমে সম্মিলিত হইয়া, একে অপরের চরিত্রের অজ্ঞতা ও তাহার ফলাফল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা দূর করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রহিবেন। এ সকল কার্য্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অতিশয় প্রয়োজন। তৈলবিহীন দীপ যেমন প্রজ্বলিত হইতে পারে না, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা ব্যতীত দাম্পত্য জীবনের কর্ত্তব্য-নিচয় তদ্রূপ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। এই সকলের অভাবে দাম্পত্য জীবনে কেবল বিচ্ছিন্নতা ও দুঃখ উৎপন্ন হয়। একে যে বিষয়ে সম্মতিজ্ঞাপন করিবেন, অপরে কিছুতেই তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন না। যদি তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া অনুমিত না হয়, সদ্ভাবে উভয়ে একত্র হইয়া, সে বিষয়ের মীমাংসা করিবেন ও একমতাবলম্বী হইবেন। সংসারের অন্ধতামসে যদি কেহ পথভ্রষ্ট হন, অপরে জ্ঞান লণ্ঠন হস্তে করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবেন। উভয়ে উভয়কে প্রকৃত প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিলে, বাহিরের ক্লেশ ও প্রলোভন হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আত্মীয় পরিজন, সন্তান সন্ততি বা দাস দাসী সমীপে উভয়ে কখনও মনোমালিন্য প্রকাশ করিবেন না। তাহাতে উভয়েরই অমঙ্গলের সম্ভাবনা। দম্পতী পরস্পরে এরূপ ব্যবহার করিবেন যে, তদ্দ্বারা পতি পত্নী, জনক জননী, গৃহকর্ত্তা গৃহিণীর ক্ষমতা ও সম্মান রক্ষা পায়। পিতৃ-মাতৃভক্ত সন্তান দৃষ্ট হইলে, তাহার মূলকারণ এইটী জানিতে হইবে যে সেই গৃহের দম্পতী পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও সম্মানপরায়ণ।

স্ত্রী চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার পাতিব্রত্য। পাতিব্রত্য ধর্ম্মালঙ্কৃত হইলে স্ত্রী চরিত্র অপূর্ব্ব শোভান্বিত হয়। সতীত্ব দ্বারা মানবী দেবী বলিয়া অভিহিতা ও পূজিতা হন। পুরাণগ্রন্থে অনেক পতিব্রতা নারীর অলৌকিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাতঃস্মরণীয়া সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ও সতী প্রভৃতি মহিলা-কুল একমাত্র পতিপরায়ণতা গুণেই জগতের নমস্যা ও পুণ্যশ্লোকা হইয়াছেন। বাস্তবিক যে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর সুখের জন্য নিজের রুধির বিন্দু বিন্দু উৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই ধন্যা।

প্রকৃত দম্পতীযুগল, পরস্পর পরস্পরের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া, সাধ্যানুরূপ সংসার ধর্ম্ম সমাপনান্তে আপনাদের অস্তিত্ব সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের মহাসত্তাতে নিমগ্ন করিয়া কৃতার্থ হন। চরিত্রবতী স্ত্রীর জীবন স্রোত পতির জীবন স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরাভিমুখীন হইলে জগতে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে। ফলতঃ, দাম্পত্য জীবন বিশুদ্ধ ও প্রেমপূর্ণ হইলে এবং দম্পতীর প্রেম পবিত্র প্রেমের আধার প্রভু ভগবানের উদ্দেশ্যে ধাবমান হইলে, জীবনের সুখ ও সৌন্দর্য্যের আর অবধি থাকে না। দাম্পত্য প্রেম প্রভাবে যদি জগতের কোন উপকার সাধিত না হইল,

যদি পরমপিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রায় প্রতিপালিত না হইল এবং সেই প্রেম বিশুদ্ধভাবে প্রেমের জলধিতে গিয়া না মিশিল, তবে দাম্পত্য জীবন বৃথা।

শ্রীবিনোদিনী সেন গুপ্ত।

জাপানী পরীর গল্প।

ফলগর্ভে মানবশিশু।

সুন্দর বসন্ত সমাগমে পৃথিবী নবনরঞ্জন সবুজবর্ণে আবৃত। নদীতীরজাত উইলোলতা মৃদু স্রোতোবেগে সঞ্চালিত। স্নিগ্ধ সমীরণ জলের উপর ক্রীড়াশীল। চারিদিকে হরিদ্বর্ণ শোভা ও মলয়ানিল যে কি সুখানুভূতি সঞ্চার করিতেছিল, ভাষায় তাহার বর্ণনা হয় না।

সেই নদীতীরে বসিয়া একটি ওবাছান* বস্ত্র ধৌত করিতেছিলেন। নদীতীরের যে স্থানটি তিনি মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুন্দর। সেখানে জল কি স্বচ্ছ! গভীর সলিলতলশায়ী উপলখণ্ড রাশি ও ছোট ছোট মিনো মৎস্যের মৃদু সন্তরণ দেখিতে এমনি পরিষ্কার যেন তাহারা তোমার হাতের উপরে রহিয়াছে! সহসা সেই বালু ভূমিতে মৃদু স্রোত সঞ্চালনে চলিতে চলিতে একটি অসামান্য বৃহদাকৃতি, সুগোল, সুন্দর, নয়নাভিরাম পীচফল ওবাছানের দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইল।

এমন আশ্চর্য্য পীচফল দেখিয়া ওবাছান বিস্ময় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বাঃ! আমি ষাট বৎসরের বৃদ্ধা, কিন্তু কোন দিন এমন বিচিত্র পীচ তো দেখি নাই! এমন অপূর্ব্ব পীচ, সুস্বাদেও বোধ হয় তদনুরূপ।" তিনি সেটিকে ধরিবার জন্য একখানি যষ্টির অনুসন্ধান করিলেন, পাইলেন না। বিফলমনোরথ হইয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে পীচফলটিকে সম্বোধন করিয়া এই মর্ম্মে এক সম্মোহন শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে,—

"আসার দূরের জল তিক্ত, নিকটের জল মধুর, তুমি তিক্ত ত্যাগ করে মধুরে এস।" তিনবার তিনি এই শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। আশ্চর্য্য! সেই কথার সঙ্গে সঙ্গে পীচ ফল ঘুরিতে ঘুরিতে ওবাছানের সম্মুখে আসিল।

ফল হাতে করিয়া ওবাছান বলিলেন,—"বুড়া দেখিলে কতই সুখী হইবে।"

তার পর বস্ত্রাদি সব গুছাইয়া লইয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে চলিলেন। তখন অনতিদূরে ওজিছান পাহাড় হইতে দূর্ব্বাদল কাটিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। ওবাছান দৌড়িয়া যাইয়া সেই পীচ দেখাইলেন।

ওজিছান বিস্মিতের মত বলিয়া উঠিলেন,—"আহা মরি! বড়ই যে অদ্ভুত। তুমি কোথা হইতে কিনিলে?"

* ওবাছান জাপান দেশের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধা এবং ওজিছান সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ।

"কিনেছি? কিনিতে দিলে?" এই বলিয়া ওবাছান পীচের বৃত্তান্ত বলিলেন। শুনিয়া ওজিছান তখন বলিলেন,—"ও গো বড় ক্ষুধা পেয়েছে!"

আর বিলম্ব সহিল না। ওজিছান নিজেই ছুরী লইয়া বসিলেন। কিন্তু এ কি চমৎকার! পীচফল কাটিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখনি তাহার ভিতর হইতে যেন শিশুর সুকোমল স্বর শ্রুত হইল। শিশুকণ্ঠ সুস্পষ্ট কহিতেছে,—"ওজিছান, ক্ষান্ত হউন!"

তৎক্ষণাৎ পীচ দ্বিখণ্ডিত হইল, সেই সঙ্গে একটি সুন্দর নৃত্যশীল বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াই বিস্ময়চকিত ওজিছান ও ওবাছান-কে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আমাকে দেখিয়া ভীত হইবেন না। নিঃসন্তান বলিয়া আপনাদের কতই না দুঃখ। তাই দেবগণ দয়া করিয়া আমাকে আপনাদের সন্তানরূপে পাঠাইয়াছেন।" সেই সন্তান-হীন বৃদ্ধ দম্পতীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? প্রত্যাশার অতীত এই দৈব অনুগ্রহের প্রতি তাঁহারা কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

পীচফল হইতে এই সন্তানলাভ তাই সুখী দম্পতী আদরে তাহার নাম রাখিলেন "মোমোটারো" অর্থাৎ "পীচশিশু।" পিতামাতার স্নেহ যত্নাদরে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতে লাগিল, ক্রমে বালক মোমোটারো বড় হইল। সেই ছোট সুন্দর পীচশিশু ক্রমে নবযৌবনে পদার্পণ করিয়া সৌন্দর্য্য, সাহসিকতা এবং অসীম শক্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিল।

এমন সময় বালক একদিন ওজিছানকে বলিল,—"পিতঃ! আমার প্রতি আপনার স্নেহযত্নের পরিমাণ ঐ পর্ব্বতের উচ্চতা হইতেও অধিক এবং ঐ স্রোতস্বিনীর গভীরতা হইতেও গভীর। আমি কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব?"

ওজিছান কহিলেন,—"কৃতজ্ঞতা আর প্রকাশ করিতে হইবে না। তুমি পুনরায় অমন কথা বলিলে আমরা প্রাণে ব্যথা পাইব। আমাদের বুড়া বয়সের শেষকালের ভার তোমাকেই বহন করিতে হইবে, অতএব আমাদের নিকট তোমাকে ঋণী হইয়া থাকিতে হইবে না।"

মোমোটারো কহিলেন,—পিতঃ! তথাপি আমি আপনাদের নিকট চিরঋণীই থাকিব, আপনাদিগকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। কিন্তু আজ আমার এক প্রার্থনা আছে। দয়া করিয়া আমাকে অল্প দিনের জন্য বিদায় দিতে আজ্ঞা হউক।

ব্যথিত—বিস্মিত পিতা বলিয়া উঠিলেন—"কোথায় যাইবে?"

তখন মোমোটারো বলিতে লাগিলেন,—অতি প্রাচীন কাল হইতে জাপানের উত্তর দিকে, মহাসমুদ্রপারে এক দ্বীপ আছে, তথায় রাক্ষসগণ বাস করে। এই রাক্ষসেরা জাপানের দেবদেবীকে মান্য করে না, উন্মত্তভাবে কেবল আপনাদের দুষ্ট অভিসন্ধি সাধন করে ও জন্মদেশের

ধনরত্ন ও মানুষের প্রাণহরণ করে। তাই আমি উহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। এক আঘাতে আমি এই রাক্ষসবংশ নিপাত করিব এবং উহাদের অতুল ধনরত্ন কাড়িয়া আনিয়া আমার মাতৃভূমি জাপানকে উপহার দিব। এই মহৎ কার্য্যের জন্ম আপনার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছি।"

ওজিছান প্রথমে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার স্মরণ হইল মোমোটারো দেবতা-প্রেরিত সন্তান, দেবগণ সর্ব্বদা তাহাকে অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। তখন তিনি কহিলেন,—"তোমার নিতান্ত যাহা ইচ্ছা, তাহাতে আমি বাধা দিব না। আর জাপানের দারুণ শত্রু এই রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া তুমি যতশীঘ্র তোমার স্বদেশ শান্তিময় করিতে পার, ততই ভাল।"

ওজিছানের উদার সম্মতিলাভে মোমোটারো বড় সুখী হইয়াছেন। তিনি অবিলম্বে আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতা ওবাছান পুত্রের জন্ম পায়সপিষ্টক প্রস্তুত করিলেন এবং বস্ত্রাদি গুছাইয়া দিলেন। শেষে যখন যাত্রার সময় আসিল, বৃদ্ধদম্পতী অশ্রুজলের সহিত পুত্রকে বিদায় দিলেন ও বলিলেন,—

"খুব সাবধানে থাকিও। বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিও।"

মোমোটারো বলিলেন,—"অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারাও খুব সাবধানে থাকিবেন।"

মোমোটারো বিদায় লইয়া দ্রুত চলিতে লাগিলেন। অবশেষে মধ্যাহ্ন কালে আহারের জন্ম এক স্থানে বসিলেন। মাতৃদত্ত পিষ্টকাধার হইতে তিনি একখানি মাত্র পিষ্টক বাহির করিয়াছেন, অমনি কোথা হইতে এক কুকুর আসিয়া দন্ত বিকাশপূর্ব্বক ডাকিতে লাগিল,—ওয়ান্! ওয়ান্! আর কহিল,—"তুই বিনা আজ্ঞায় আমার রাজ্যে আসিয়াছিস্, যদি আমায় তোর ঐ আহারসামগ্রী না দিস্, তোকে এখনই গ্রাস করিব।"

মোমোটারোর হাঁসি পাইল। বলিলেন "আরে হতভাগা কুকুর! তুই জানিস না আমি জাপানের শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে যাইতেছি? যদি বিরক্ত করিস, এই মুহূর্ত্তেই তোকে বধ করিব।"

শুনিয়া কুকুর তখন অবনতদেহে দুই পায়ের ভিতর লেজ গুটাইয়া ভীত ও বিনীতভাবে বলিতে লাগিল,—"আমি বীরশ্রেষ্ঠ মোমোটারোকে চিনিতে পারি নাই। ভৃত্যের এই দুর্ব্যবহারের জন্ম সে হুজুরের যথার্থ ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছে। দয়া করিয়া জাপানের এই শত্রুনিপাত সময়ে দাসকে সঙ্গে লইতে অনুমতি হউক।"

মোমোটারো কুকুরকে ক্ষমা করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

কুকুর কহিল,—"ইহা অপেক্ষা আর আমার কি সৌভাগ্য হইতে পারে?" ইহাই বলিয়া সে কিঞ্চিৎ খাদ্য প্রার্থনা করিল।

মোমোটারো একখানি পিষ্টক ফেলিয়া দিলেন। কুকুর পিষ্টক আহার করিয়া প্রভুর সঙ্গে চলিতে লাগিল। অনেক পর্ব্বত ও উপত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহারা বহুদূর গিয়াছেন, এমন সময়ে সহসা বনমধ্যে বৃক্ষশাখা হইতে কোন জন্তু মোমোটারোর সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল ও অবনতমস্তকে কহিল,—"মহাপুরুষ মোমোটারো! জাপানের শত্রুকুলের সহিত যুদ্ধে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে সঙ্গী হইতে অনুমতি করুন।"

কুকুর সক্রোধে তাহার সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"অরে পার্ব্বত্য মর্কট! যুদ্ধে তুই কোন্ কাজে লাগিবি? আমি—একমাত্র আমি—মহাত্মা মোমোটারোর সঙ্গী হইয়াছি।"

তখন দুই জানোয়ারে বড় বিবাদ বাধিল। আসল কথা কুকুর ও বানরে কোন দিন একতা হয় না। কুকুরের তিরস্কারে বানরের বড় অসহ্য হইল। সে কুকুরকে কহিল,—"নীচ! তুই নিজেকে বড় মনে করিতেছিস্।" ইহা বলিয়াই সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রস্তুত হইল। বানর তরবারীর পরিবর্ত্তে তাহার প্রখর দন্ত বহির্গত ও ধারাল নখ প্রসারণ করিয়া কুকুরের দিকে ধাবিত হইলে মোমোটারো অগ্রসর হইলেন। কহিলেন,—"কুকুর ক্ষান্ত হও, অত ব্যস্ত হইও না। এই বানরটী মন্দ লোক নহে, ইহাকে আমার সঙ্গী করিব।" ইহাই বলিয়া তিনি বানরকে পিষ্টক খাইতে দিলেন। বানর আনন্দে পিষ্টক ভক্ষণ করিয়া মোমোটারোর দলভুক্ত হইল। কিন্তু হইলে কি হয়? দুই জানোয়ারে কখনও একতা হয় না। তাই অবশেষে মোমোটারো যুক্তি করিয়া তাঁহার যুদ্ধ-পতাকা বানরের হস্তে দিয়া তাহাকে সম্মুখে এবং তরবারী কুকুরকে দিয়া তাহাকে পশ্চাতে রাখিলেন। তাঁহার হাতে রহিল শুধু পাখা খানি।*

চলিতে চলিতে যখন তাঁহারা জনহীন মরুপ্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, তখন সহসা সেখানে এক আশ্চর্য্য পাখী উড়িয়া আসিল। পাঁচটি অপূর্ব্ব বিভিন্নবর্ণে তাহার সুন্দর পালক সুশোভিত এবং শিরোদেশ উজ্জ্বল লোহিতবর্ণে সুরঞ্জিত।

কুকুর পাখীটিকে দেখিয়াই ভাবিল একগ্রাসে শিকার ভক্ষণ করিবার এই তো সুযোগ! কিন্তু মোমোটারো বাধা দিলেন, তাই তাহার আশা সফল হইল না।

মোমোটারো কহিলেন,—"বড় বিচিত্র পাখী! আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে।" তিনি পাখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমার মতলব কি? যদি মন্দ মতলব থাকে, কুকুর এখনই তোমার মস্তক ভক্ষণ করিবে, আর যদি আমার কাজ করিতে চাও, সঙ্গে এস।"

তখন পাখী কহিল,—"আপনি মহান্

* ইউরোপীয় প্রণালীতে সৈন্যসজ্জার অনেক পূর্ব্বেই জাপানে "গানছেন" অর্থাৎ যুদ্ধ-পাখা রণক্ষেত্রের উপকরণ ছিল। তাহা সৈনিক কর্ম্মচারীদের অঙ্গুলি নির্দ্দেশের কাজ করিত।

মোমোটারো, আমি নিরীহ ক্ষুদ্র পাখী। কিন্তু জাপানের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সঙ্গী হইতে অনুমতি করুন।"

কুকুর অমনি লাফাইয়া আসিয়া বলিল,—"এই নীচ জন্তুটাও নাকি আমাদের সঙ্গে যাইবে?"

"কুকুর! সে জিজ্ঞাসায় তোমার প্রয়োজন নাই।" ইহাই বলিয়া মোমোটারো তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন,—"যদি তোমরা সামান্য কারণে বিবাদ কর, এখনি তাড়াইয়া দিব। রণক্ষেত্রে উত্তম কায়দা সৌভাগ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং একতা সৌভাগ্য ও উত্তম কায়দা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। যদি আমরা সম্মিলিত দেহ মন প্রাণে যুদ্ধ না করি, শত্রু দুর্ব্বল হইলেও আমরা তাহার উপর জয় লাভ করিতে পারিব না।"

তিনটি প্রাণী শ্রদ্ধার সহিত এই উপদেশ শুনিল ও একান্ত আনুগত্য স্বীকার করিল।—তারপর পাখী নিয়মিত পিষ্টক গ্রহণ করিয়া দলভুক্ত হইলে তাঁহারা পুনরায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

চলিতে চলিতে অবশেষে দেখা গেল সম্মুখে এক বিশাল সমুদ্র। সে অনন্ত জলরাশির মধ্যে একটিও দ্বীপ নয়নগোচর হয় না। আর কিছুই নাই—কেবল ফেনপুঞ্জময় উত্তাল তরঙ্গমালা! যেন সমুদ্রতলনিবাসী কোন জলদৈত্য ইহাকে অবিরাম আলোড়ন করিতেছে।

কুকুর, বানর, পাখী—তিনটাই শুক মৃত্তিকা বাসী; কোনও দিন সাগরের বিচিত্র জলখেলা দেখে নাই। যদিও তাহারা সমুচ্চ পর্ব্বতচূড়া ও সুগভীর উপত্যকা দেখিয়া কখনও ভীত হয় না, কিন্তু যখনি সম্মুখে মহাসাগরের পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গভঙ্গী দেখিল, তখনি ভীত ও নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

এই ব্যাপার দেখিয়া মোমোটারো কহিলেন,—"তোরা কি ইতস্ততঃ করিতেছিস্? ভীরু! এমন সঙ্গীর অপেক্ষা একাকী আসা ভাল ছিল। যাহাহউক, তোদের সাহায্য আবশ্যক নাই, ফিরিয়া যা!"

তাহারা এই র্ভৎসনায় অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তাহাদিগকে পরিত্যাগ না করিবার জন্য বিনয়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিল। মোমোটারো যখন দেখিলেন তাহারা ক্রমে সাহস অনুভব করিতেছে, তখন তিনি তাহাদিগকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে তাহারা নৌকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইল।

অনুকূল বায়ু বহিয়াছে। দেখিতে দেখিতে উষার কুয়াসায় সাগরতীর বিলীন হইল। সঙ্গী তিনটির প্রাণ প্রথমে বড়ই ব্যাকুল হইল, কিন্তু অভ্যাসে ক্রমে সে ভাব রহিল না। তখন তাহারা সমুদ্রতরণীর উপরে দাঁড়াইয়া উৎসুকনয়নে সাগরদ্বীপের দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় বসিয়া না থাকিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন গুণপনা প্রকাশ করিতে লাগিল। কুকুর দ্বীপ-

দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উঁচু হইয়া বসিয়া যেন প্রার্থনাস্বরে কোঁ কোঁ করিতে লাগিল, বানর, লম্ফ ঝম্ফ প্রদানপূর্ব্বক নৃত্য আরম্ভ করিল, পাখী করুণকণ্ঠে গান ধরিল!

মোমোটারো অত্যন্ত আমোদ বোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ঐ যে, দ্বীপ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে! তাঁহারা দেখিলেন সাগরবক্ষে কোনও শিল্পী যেন একটি ঘননীলবর্ণ শৈল খুদিয়া তুলিয়াছে। তাহার শিরোদেশে তোরণদ্বার ও চারিদিকে লৌহময় প্রাচীর। দ্বীপবাসীদের বাড়ীঘর পরস্পর ঘনসন্নিবদ্ধ এবং ছাদ লৌহ-নির্ম্মিত। চারিদিকে অসংখ্য পতাকা বায়ুভরে আকাশে উড়িতেছে। সত্যই যেন দুর্ভেদ্য দুর্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল। মোমোটারো পাখীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"সৌভাগ্যের বিষয় তোমার পাখা আছে; এই মহূর্ত্তে উড়িয়া যাও, দেখিয়া আইস দ্বীপবাসী রাক্ষসেরা কি করিতেছে।"

পাখী তখনি অবনতশিরে আজ্ঞাগ্রহণ পূর্ব্বক দ্বীপে উড়িয়া গেল। সেখানে রাজ্যের যত রাক্ষস সব তাহাদের গৃহের ছাদের উপর একত্র হইয়াছে।

তখন শৃঙ্গের উপর পাখী গাহিল,—"শোন্, ওরে দ্বীপবাসী রাক্ষসগণ! সেই মহান্ 'সূর্য্য দেবের' * প্রতিনিধি আজ সৈন্যদল সঙ্গে তোদের সবংশে বিনাশ করিতে উপস্থিত। যদি প্রাণ বাঁচাতে ইচ্ছা থাকে, অবিলম্বে আত্মসমর্পণ কর্!"

বিকটহাস্যে রাক্ষসেরা সে কথার উত্তরে বলিতে লাগিল,—"ওরে তুচ্ছ পাখী! এখনি তুই আমাদের অস্ত্রের গুণ জানিতে পারিবি।" ইহা বলিয়াই রাক্ষসেরা শরীরে বাঘছাল জড়াইয়া অস্ত্রধারণ করিল। কিন্তু রণনিপুণ বলবান্ পাখী তখন মুহূর্ত্তমধ্যে নামিয়া আসিয়া তাহার দারুণ চঞ্চুর এক আঘাতে একটা লোহিত রাক্ষসের † মস্তক শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন বড় ভয়ানক যুদ্ধ বাধিল। কিন্তু সেই সময় তোরণ দ্বার খুলিয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে কুকুর ও বানর রাক্ষস দিগকে আক্রমণ করিল। রাক্ষসেরা শুধু পাখীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল, এখন শত্রু-সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া, ব্যস্ত হইল ও বিপুল-প্রয়াসে যুদ্ধ করিতে লাগিল। লাল, নীল ও কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসের ছোট্ট ছোট ছেলেরা পর্য্যন্ত যুদ্ধে যোগ দিয়াছে। রণক্ষেত্রের সেই অগণিত রাক্ষসের বিষম চীৎকার সাগরকূলপ্লাবী উত্থিত তরঙ্গধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া ভয়ানক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছে। রাক্ষসেরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আঁটিতে পারিল না। জাপানের তিন জন্তুর দারুণ আক্রমণে তাহাদের অনেকে পর্ব্বত হইতে গভীর গহ্বরে পড়িল, অনেকে প্রাণ হারাইল।

তারপর রাক্ষসপ্রধান অবশিষ্ট। সেও শেষে অস্ত্রত্যাগ করিয়া আত্মসমর্পণের

* জাপানী ভাষায় সূর্য্য দেবীরূপে বর্ণিত।

† জাপানী প্রবাদ অনুসারে লাল, নীল, কৃষ্ণ, তিনপ্রকার রাক্ষস।"